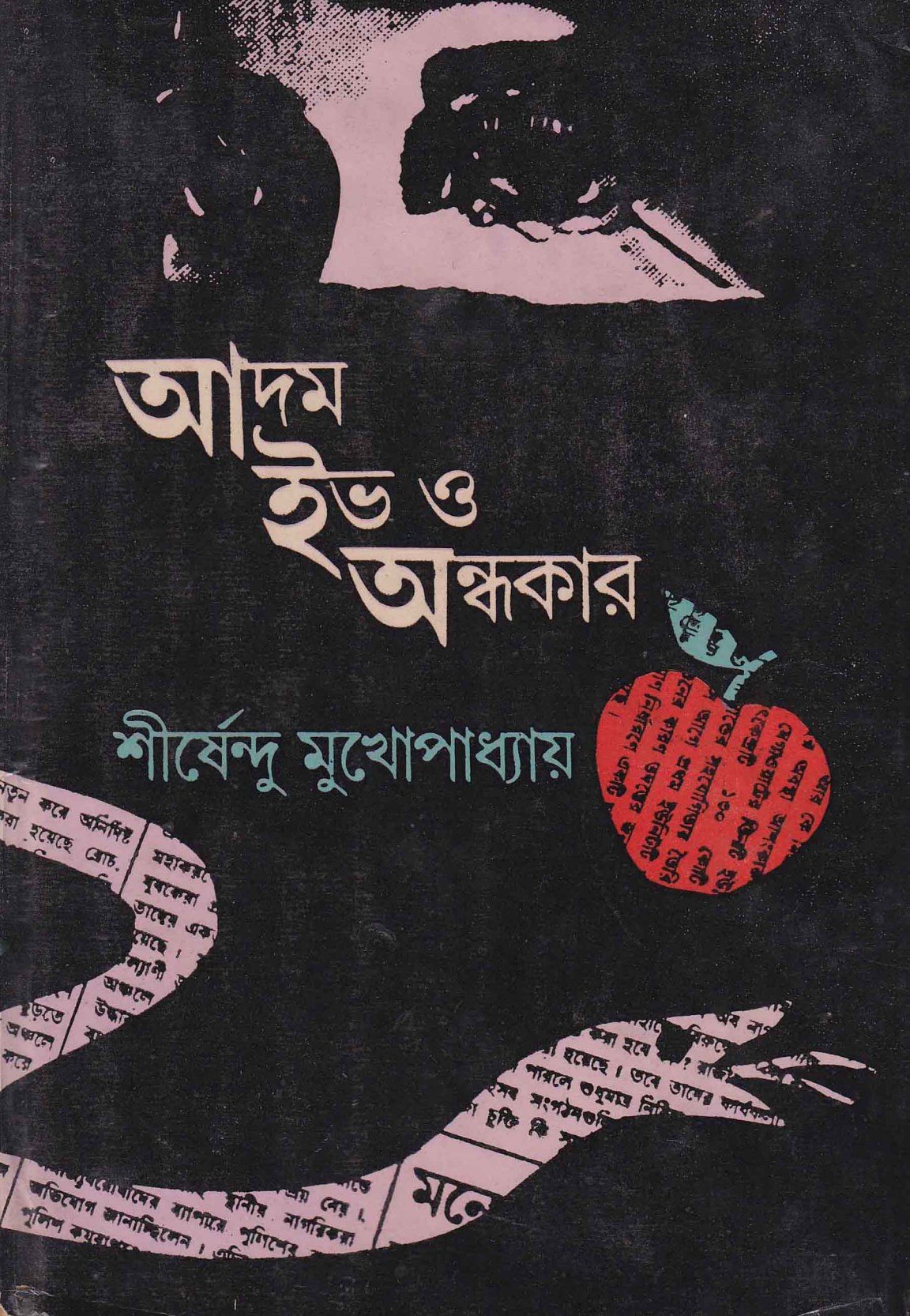

আদম ইভ ও অন্ধকার

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

Ayan Chatterjee
Digitally signed by Ayan Chatterjee
DN: cn=Ayan Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.10.31 01:40:44 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

এই লেখকের অন্যান্য বই

ঘুণপোকা

কাগজের বউ

আশ্চর্য ভ্রমণ

যাও পাখি

দিন যায়

শ্যাওলা

লাল নীল মানুষ

ক্ষয়

ফজল আলি আসছে

নীলু হাজরার হত্যা রহস্য

ফুল চোর

শিউলির গন্ধ

উজান

জাল

দূরবীণ

মনই সকল শক্তির উৎস। একথা উমাপতির চেয়ে ভাল আর কে জানে ? এই মনটাকে এক জায়গায় সই করতে পারলেই কাজ ফর্সা। মনের জোরেই উমাপতি এত বছর টিঁকে আছেন পৃথিবীতে। কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত মৃত্যুর ছোবল, হতাশা কাটিয়ে এই এত দূর।

সেই মনের জোরেই আজ বিছানা থেকে নিজেকে সকালবেলায় টেনে তুলতে পারলেন উমাপতি। নইলে শরীর আজ মোটেই যুতের নয়। একেবারেই নয়। প্রেশারটা খুবই বেড়ে থাকবে। স্পণ্ডেলিওসিসের উৎপাতটাও তো বাস্তবিক কখনও তাঁকে ছেড়ে যায়নি। অন্য কেউ হলে উঠত না, শুয়ে থাকত। ডাক্তার ডাকত। উমাপতি শরীরে বিশ্বাসী নন। প্রায় সারা জীবনটাই তিনি দেশবাসীকে বলে এসেছেন, আত্মত্যাগ করো, আত্মত্যাগ করো, আত্মত্যাগ করো। কেউ করেছে কিনা তা সঠিক জানেন না উমাপতি, কিন্তু ওকথাটা তাঁর মনের মধ্যে বিকারের মতো আবর্তিত হয়। ভাঙা রেকর্ডের মতো বাজতেই থাকে। আত্মত্যাগ করো, আত্মত্যাগ করো, আত্মত্যাগ করো। দেশবাসীর জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, আদর্শের জন্য।

এদেশের মানুষ বোধহয় মল ও মূত্র ছাড়া আর কিছুই ত্যাগ করে না আজকাল।

উমাপতির এই বাসস্থানটিকে যদি ফ্ল্যাট বলা হয় তবে খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। দু'খানা ঘর আছে ঠিকই, একখানা আলাদা বাথরুমও, এমন কি অবিশ্বাস্য একখানা রান্নাঘরও। সবই লাগোয়া। তবু ফ্ল্যাট কথাটা এর সঙ্গে খাপ খায় না।

উনিশ শতকের শেষভাগে বাড়িখানা তৈরি হয়ে থাকবে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে কিছু সংস্কার হয়ে থাকলেও থাকতে পারে। তারপর থেকে লাগাতার একইরকম রয়ে গেছে। না, ঠিক একরকম নয়। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের অমোঘ নিয়মে বাড়িখানা যথাযথ রকমের জরাজীর্ণ হয়ে এসেছে। এখন প্রায় প্রতিটি দেয়ালেই পলেস্তারা খসিয়ে ইঁটের হাসি বেরিয়ে পড়ছে। সেই হিমশীতল মৃত্যুপ্রতিম নিঃশব্দ হিঃ হিঃ হাসি প্রতিনিয়তই শুনতে পান উমাপতি। ভাড়া মাত্র চল্লিশ টাকা বলে ইহজীবনে আর বাসাবদল ঘটবে না উমাপতির। কিন্তু এক একদিন এক এক অভিনব জায়গা দিয়ে যখন ইঁটের হাসি বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসে তখন উমাপতি যেন কেমন আতংক বোধ করেন।

বাথরুমের চৌকাঠ ধরে একটা টাল সামলালেন উমাপতি। পাশেই রান্নাঘরের দরজায় বসে মেজো ছেলে মনোজের বউ শ্রীময়ী বঁটিতে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। মোলায়েম গলায় বলল, বাবার কি শরীরটা খারাপ ?

নাঃ। বুড়ো বয়স তো ! একটু আধটু মাঝে মাঝে মাথা-ফাতা ঘোরে আর কি।

বলেই উমাপতি জমাট অন্ধকারে বাথরুমে ঢুকলেন। এই অন্ধকার বাথরুম কলকাতায় কমই আছে। আলোটা জ্বালালে অসুবিধে নেই। কিন্তু উমাপতি দিনের বেলায় বাড়িতে কোনও আলো জ্বালানো সইতে পারেন না। "যে জন দিবসে মনের হরষে····" মনে পড়ে যায়। এটাও একটা বিকারই হবে। দিনের বেলা আলো জ্বালতে গেলেই মনে পড়ে যাবেই কি যাবে। গত চল্লিশ বছর উমাপতি ও কাজ করেননি। অন্ধকারে অবশ্য তেমন অসুবিধে নেই। সবই মুখস্থ। ডানধারে শুকনো চৌবাচ্চায় রাশিকৃত আবর্জনা রাখা। সামনে মুখোমুখি কল এবং তার নিচে জলের বালতি। বাঁ ধারে পায়খানা। ওপর থেকে কোনও একটা ফাটল দিয়ে পায়খানার ওপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। ওপরে বাড়িওলার বাথরুম, কাজেই জলটা খুব বেশি পবিত্র না হওয়ারই কথা। কিন্তু সেটা ভাবতে নেই বলে উমাপতি ভাবেন না। ওই জলের ফোঁটাটা ঠিক কোথায় পড়ে তাও তাঁর মুখস্থ। বাঁ ধারে একটু কেৎরে বসতে হয়। ফোঁটাটা ডানধারে হাঁটু ঘেঁষে নেমে যায়।

সবই অভ্যাস। অভ্যাসের বাইরে আজকাল কদাচিৎ যাওয়া হয়। কারও কাছ থেকে অনুগ্রহ গ্রহণ না করার অভ্যাস তাঁর বরাবরের। কিন্তু গিন্নীর তাগিদে একবার সরকারী ফ্ল্যাটের আশায় তাঁকে রাইটার্স বিল্ডিংসে যেতে হয়েছিল। যে ব্যক্তি ফ্ল্যাট দেওয়ার কর্তা তিনি উমাপতিকে বিলক্ষণ চেনেন। কিন্তু ফ্ল্যাটের কথায় এমন চমকে উঠে বিস্ময়ভরে অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন যে উমাপতির

মায়া হল। ভদ্রলোক তখন কেবল অস্ফুট গোঙানির শব্দ করে বলছেন, ফ্ল্যাট···ফ্ল্যাট ····· !

উমাপতির একবার মনে হল তিনি ভুল জায়গায় এসেছেন। তাই তাড়াতাড়ি বললেন, থাক, প্রসঙ্গটি বরং····

ভদ্রলোক তখন মৃদু হেসে করুণ মুখে বললেন, ওই একটা কথা শুনলেই আজকাল আমার এমন এলার্জি হয় যে কী বলব। সারাদিন আমার কাছে শয়ে শয়ে লোক আসে, তারা হাঁ করে, তারপর মুখ বন্ধ করে। আর একটাই শব্দ বুলেটের মতো বেরিয়ে আসে। ফ্ল্যাট। শুনতে শুনতে মাথা ঝিম ঝিম করে, কান ভোঁ ভোঁ করে। এই তো সেদিন আমার নাতি সি এ টি ক্যাট পড়ছিল বসে বসে। আর আমি শুনছিলুম, নাতি বলছে, ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট।

উমাপতি খুব সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, থাক ভাই থাক। ফ্ল্যাট বরং আপনি সুবিধেমতো লোককেই দেবেন। আমার চলে যাবে।

বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে শ্রীময়ী ডাকল, বাবা, আপনার হয়েছে ? জলের শব্দ পাচ্ছি না কেন ? শরীর খারাপ করেনি তো !

আরে নাঃ। ঠিক আছে। সব ঠিক হ্যায়।

উমাপতি যতদূর সম্ভব স্মার্টনেসের সঙ্গে ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এলেন।

সামনের ঘরে বিছানায় দুটো ঘুমন্ত নাতির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জায়গায় উমাপতির স্ত্রী কমলাবালা বসে একটা বড় তামাকপাতা থেকে অল্প অল্প ছিঁড়ে একটা কৌটোয় ভরছেন। এই একটাই নেশা ওঁর। একটু পান, একটু কাঁচা তামাকপাতা, সামান্য চূণ আর সুপারি। এইটুকু হলে তাঁর ভাতও চাই না। উমাপতি খুব ভালভাবেই জানেন যে, এই ভদ্রমহিলাকে তিনি সারাজীবনই শোষণ ও নিপীড়ন করে এসেছেন। দেশসেবকদের স্ত্রীরা উপেক্ষিত হয়েই থাকেন। কমলাবালা তার ব্যতিক্রম নন। শাড়ি গয়না তো অনেক দূরের কথা, ভাল করে খাওয়া জোটানো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সিনেমা থিয়েটার গানবাজনা ওসব যেন স্বপ্নপুরীর ব্যাপার। কমলাবালা ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনতে লাগলেন নিজেকে। একমাত্র তামাকপাতায় এসে তাঁর জীবনের সব রসকষ আনন্দ কেন্দ্রীভূত হল। এক টুকরো পান, একটু তামাকপাতার মধ্যে তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন যেন। উমাপতি সেজন্য বিশেষ লজ্জিত নন। তবে বুড়িটার জন্য আজকাল একটু একটু কষ্ট হয়। মনে মনে তিনি চান, বুড়িটা যেন কষ্ট করে মরে-টরে না যায়। তামাকপাতা-টাতা চিবিয়ে যেমন করেই হোক যেন কিছুদিন বাঁচে।

কমলাবালা অবশ্য বিষদৃষ্টিতে আপাতত তাঁর স্বামীকে এফোঁড় ওফোঁড় করার

www.boiRboi.blogspot.com

চেষ্টা করছিলেন। এই আদ্যন্ত বেহায়া, নির্লজ্জ, দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটিকে বাক্যে বা কটাক্ষে আজ অবধি কিছুমাত্র সংশোধন করে উঠতে পারেননি। একগুঁয়ে, জেদী এ লোকটা বরাবর নিজের সিদ্ধান্তে — তা ভুল হলেও—চলেছে। কমলাবালা তার জন্য ঝাঁপাঝাঁপি কিছু কম করেন না। আজও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

কমলাবালা যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, খুব আঁট করে চেয়ারে বসছো যে। বলি হাসপাতালে যেতে হবে না?

উমাপতি মাথা নেড়ে বললেন, হবেই তো। বউমা খাবারটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে দিলেই রওনা হয়ে পড়ব।

জামাকাপড়টা অন্তত পরে থাকো। মেয়েটা হেদিয়ে পড়ে আছে, দেরী করে গেলে চলবে? তোমার না হয় দায়িত্বজ্ঞান নেই, তা বলে····

উমাপতি মিনিট পাঁচেক তাঁর নানা কুকার্য ও চারিত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতির কথা কমলাবালার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুনে গেলেন। বেশ শান্তভাবেই শুনলেন।

পাঁচটা মিনিট একটু দম ফিরে পাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাঁর। শরীরটা আজ একেবারেই যুতের নেই। কিন্তু কমলাবালা সে ফুরসুৎ তাঁকে দিলেন কই। উমাপতি উঠলেন এবং খাটের বাজু থেকে তাঁর চিরাচরিত হেঁটো ধুতিখানা নামিয়ে নিয়ে পরলেন। গায়ে চড়ালেন খদ্দরের পানজাবি।

মেয়ের শ্বশুরবাড়ি দুর্গাপুর। বিয়ের পর প্রথম বাচ্চা হতে কলকাতায় এসেছে। অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বাচ্চা হওয়ার দায় বাপের বাড়িতেই বহন করতে হয়। নিয়মটা মানতে উমাপতির বিশেষ আপত্তি নেই। মেয়েটাও তাঁর আদরের। কিন্তু গোলমাল বাঁধাচ্ছে শরীরটা। বেশ কয়েকদিন যাবৎ সকালে উঠে তাঁর মনে হয়, আজকের দিনটা বুঝি কাটবে না। হাসপাতাল রওনা হওয়ার সময় রোজ বোধ হয়, আজ কিছুতেই গিয়ে পৌঁছোতে পারব না।

বড় ছেলে পঙ্কজ চাকরি করে রেলে। গয়ায় পোস্টিং। সপরিবারে সেখানেই থাকে। মেজো মনোজের ইতিহাস কিছু বিচিত্র। শ্রীময়ীকে তার পছন্দ নয় বলে বিয়ের পর থেকেই ঝামেলা পাকিয়েছিল। সেই ঝামেলা বহু দূর গড়াল শেষ অবধি। শ্রীময়ী দুটো ফুটফুটে ছেলে প্রসব করল একসঙ্গে। তারপরই হঠাৎ মনোজ বাড়ি থেকে বেপাত্তা হয়ে গেল। মাসখানেক গভীর দুশ্চিন্তায় কাটানোর পর সে শ্রীরামপুর থেকে একটা চিঠি দিয়ে জানাল যে, নিজের পছন্দমতো একটি মেয়ের সঙ্গে সে ঘর বেঁধেছে। তবে সে পাষণ্ড নয়। স্ত্রী এবং পুত্রদের ভরণপোষণবাবদ কিছু পাঠাবে বাড়ি প্রতি মাসে। তা পাঠায়ও। তবে নিজে সে আর এমুখো হয় না। শ্রীময়ীর বাপের বাড়ির অবস্থা অবশ্য অকথ্য রকমের

খারাপ। মা নেই, বাপ ধুঁকছে। সেখানে আশ্রয় নিতে যাওয়ার মানে আত্মহত্যা। শ্রীময়ী তবু যেতে চেয়েছিল, উমাপতি দেননি। বস্তুত গরিবের ঘরের সুলক্ষণা মেয়েটিকে তাঁরই আগ্রহে বউ করে আনা হয়েছিল। দায়টা উমাপতিকে বহন করতে হচ্ছে। ছেলে ঘর ছেড়ে যাওয়ায় কমলাবালা শ্রীময়ীর ওপর খুশি ছিলেন না। তাঁর ধারণা বরকে বশ করার মতো সৌন্দর্য ও ছলাকলা না থাকাটা শ্রীময়ীরই দোষ। পরে অবশ্য যমজ নাতিদের প্রতি টান আসায় কমলাবালা আর ঝামেলা করেননি। বিশেষত যখন শ্রীময়ীর ওপরেই গোটা সংসার। উমাপতির ছোটো ছেলে সরোজ। সে অবশ্য বেকার এবং বাড়িতেই থাকে। অতিশয় নরম, ভীতু এবং মানসিক ভারাক্রান্ত ছেলে। প্রায় কোনো কাজেই তাকে পাওয়া যায় না। এমনিতেও বেশ রোগাভোগা। হাসপাতালে তিনবেলা গিয়ে দিদির খাবারটুকু সে পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু হাসপাতালে গেলে নাকি ওষুধের গন্ধে তার গা গুলোতে থাকে। রুগী দেখলে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। উমাপতি একবার রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তোকেই যদি কখনও রুগী হয়ে যেতে হয় তখন কী করবি? এ অলক্ষুণে কথায় কমলাবালা চটে গিয়ে কুরুক্ষেত্র করেছিলেন।

উমাপতির বাসাটা গলির মধ্যে। সামনেই খোলা নর্দমা, সরু রাস্তা, উল্টোদিকে একটা কারখানার টানা দেয়াল। গলিটা কানা বলে এরাস্তায় লোক চলাচল খুবই কম।

একহাতে টিফিন ক্যারিয়ার ও অন্য হাতে ছাতা নিয়ে সদর খুলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েও উমাপতির মনে হল, আজ না গেলেই যেন ভাল হত। তিনি কি বাস্তবিকই পৌঁছোতে পারবেন?

কিন্তু মনের জোর! হ্যাঁ, মনের জোর দিয়ে সব হয়।

দুটো অচেনা ছেলে কারখানার দেয়ালে পিঠ রেখে নিচু স্বরে কী যেন কথা বলছিল। উমাপতি বেরোতেই একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল। উমাপতি ছেলে দুটোর দিকে একটু চেয়ে রইলেন। এ গলিতে অচেনা মুখ দেখা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।

বড় রাস্তা অবধি উমাপতি মনের ব্যায়াম করতে করতে চলে এলেন। বারবার নিজেকে বললেন, তোমার কিছুই হয়নি, কিছু হয়নি, নাথিং রং। মনটাকে শক্ত করো হে। মনের জোরই আসল।

বড় রাস্তার মুখে এসে উমাপতি সেই অস্বস্তিটা টের পেলেন, যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। বলা যেতে পারে যে, উমাপতি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পেলেন, পরিস্থিতিটা বিশেষ সুবিধের নয়।

অতীতে দাঙ্গার সময় বা যে কোনরকম হাঙ্গামার প্রাক্কালে উমাপতি মাঝে

www.boiRboi.blogspot.com

মধ্যে এই অস্বস্তিটা বোধ করেছেন। আজও করলেন। যদিও চারদিক মোটামুটি স্বাভাবিক। রিক্সা ঠেলা মোটরগাড়ি চলছে, লোকজন যাতায়াত করছে, রোজকার মতোই জীবন চলমান। তবু উমাপতির মনে হল, কী যেন থমথম করছে চারদিকে, কী যেন একটা ঘোঁট পাকিয়ে উঠছে।

এপাড়া এমনিতেই ভাল নয়। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট-এর আশেপাশের জায়গা সাধারণতঃ খুব একটা শান্ত হয়ও না। তার ওপর আছে রেলের ইয়ার্ড। ওয়াগন ব্রেকারদের আস্তানা চারদিকেই। নিত্য নতুন মস্তান উঠে এসেছে। দু দলে মারপিট, বোমাবাজি প্রায় নিত্যকার ঘটনা। একসময়ে এই পাড়ায় উমাপতি রাস্তায় বেরোলে লোকেরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিত, কত লোক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম অবধি করেছে। উমাপতি তখন এখানকার শ্রমিকদের হয়ে লড়তেন, মিউনিসিপ্যালিটিকে শাসন করতেন, রাজনৈতিক নেতা বা এম এল এদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল তাঁর। আজও সেই একই পাড়ায় আছেন, কিন্তু সমাজজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ কেটে গেছে। নতুন প্রজন্মের মানুষেরা তাঁকে চেনে না, যুব সম্প্রদায়ের কাছে তিনি প্রায় বিস্মৃত। এভাবে নিজের সামাজিক মৃত্যু দেখে যে কারও দুঃখ হওয়ার কথা। উমাপতিরও হয়তো হয়। কিন্তু তিনি নিয়তির অমোঘ বিধানকে মানেন। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাল রেখে তিনি ছুটতে পারলেন কই ? সে আমলের মাতব্বররা অনেকেই মরে গেছে, যারা আছে তারা বৃদ্ধ, অথর্ব, পঙ্গু, গৃহবন্দী। দু-চারজন সচল আছে বটে, কিন্তু তারা নিজেদের নিয়ে ভারী ব্যতিব্যস্ত। চিরদিন তো কারও সমান যায় না। এ পাড়া একসময়ে খানিকটা ভদ্রস্থ ছিল, যখন ভদ্রলোকেরা পাড়া শাসন করত। আজ আর তা নেই। ভদ্রলোকদের দিন ফুরিয়েছে। তবে উমাপতিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদায় না চিনলেও পাড়ার একজন পুরোনো মানুষ হিসেবে সকলেই চেনে। সকলে এও জানে যে, উমাপতি একসময়ে স্বদেশী করেছেন, জেল খেটেছেন, স্বাধীনতার পরেও বেশ কিছুদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সে-হিসেবে সামান্য একটু পরিচিতি আজও নেই-নেই করেও আছে।

উমাপতি চারদিকটা আর একবার ভাল করে দেখলেন। না, কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। সব কিছু স্বাভাবিক। সব ঠিক হ্যায়। বাদল বা কালুর দল কোনও নতুন হাঙ্গামা করেনি পরশু থেকে। কোথাও কোনও খুনের কথা শোনেননি উমাপতি।

তবে মনটার এত অস্বস্তি কেন ?

মালাধরের চায়ের দোকানটা বাস স্টপের পিছনের গলিতে এক পা ঢুকলেই। দোনোমোনো করেও উমাপতি গলিতে ঢুকে দোকানে উঁকি দিলেন। সরোজ

www.boiRboi.blogspot.com

বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছে।

উমাপতি ডাকলেন, ওরে শোন।

সরোজ উঠে এল, কী বলছো বাবা ?

উমাপতি কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর এই দুর্বল প্রকৃতির ছেলেটিকে তাঁর বলতে ইচ্ছে করছিল, এখানে আর বসে থাকিসনি। বাড়ি যা। কিন্তু কথাটা বললেই তো হল না। অস্বাভাবিক শোনাবে। কী বলা যায় ভাবতে ভাবতে তিনি মাথা চুলকে বললেন, তোর মার শরীরটা ভাল নয়। একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস।

সরোজ ঘাড় নাড়ল।

উমাপতি এর বেশী আর বলতে পারলেন না। বলতে পারলেন না যে, তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কিছু অস্পষ্ট আভাস দিচ্ছে।

সরোজকে নিয়ে চিন্তার একটি কারণ হল স্বপন নামে একটি ছেলে। সরোজের সঙ্গে ক্লাস থ্রী থেকে একটানা পড়েছে। বাল্যবন্ধু এবং বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

স্বপন কিছু খারাপ ধরনের ছেলে ছিল না। সরোজের মতো নরম সরল না হলেও ভদ্র ছেলে। কিন্তু গত বছর খানেক যাবৎ কোনও রহস্যময় কারণে সে বাদলের দলে ভিড়েছে। কারণটা অর্থনৈতিক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বপন আর সরোজ যে একসময়ে একসঙ্গে কবিতাটবিতা লেখার চেষ্টা করত এবং "নীলাকাশ" নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনও কয়েক সংখ্যা বের করেছিল এটা উমাপতি ভুলতে পারেন না। তাই ব্যাপারটা তাঁর কাছে ভারী অদ্ভুত ঠেকে।

বাদলের দলে ভিড়বার পর থেকেই স্বপন আর উমাপতির বাসায় যায় না। খুনখারাপী করে কিনা কে জানে, তবে স্বপন মস্তান হলেও তার হাবভাব বেশ গম্ভীর এবং শান্ত। উঠকো তরল মস্তানী তার নেই। আর এখনও সরোজের সঙ্গে তার গভীর ভাব।

উমাপতির দুশ্চিন্তার কারণ এইটাই। স্বপনের সঙ্গে সরোজের সম্পর্কটা না থাকলেই তিনি বেশী খুশি হতেন।

অনভিজ্ঞেরা কলকাতা বা হাওড়ার যে-কোনও হাসপাতালে পা দিয়েই মর্ত্যের নরক দেখে আঁতকে উঠবে সন্দেহ নেই। কিন্তু উমাপতি অনভিজ্ঞ নন। হাওড়ার এই হাসপাতালকে তিনি নিজের হাতের তেলোর মতোই জানেন। বহুবার আসতে হয়েছে। এখানকার খাবার দেখলে কুকুর মুখ ফিরিয়ে নেয়, লাশ পড়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রুগীরা বিছানাতেই পায়খানা পেচ্ছাপ করে তাতেই ডুবে থাকে, জমাদার নার্স আয়া ঝাড়ুদারদের দেখা মেলে না আলাদা পয়সা না

ফেললে। ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ায় যথেচ্ছ কুকুর ও বেড়াল।

চন্দনা আছে কেবিনে। কেবিনের অবস্থা যে খুব বেশী ভাল নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চন্দনার নিজস্ব আয়া আছে এবং আয়া দুজনই উমাপতির চেনা। পাড়ার মেয়ে, চন্দনাকেও চেনে। তারা পালা করে থাকে বলে চন্দনা একরকম সইয়ে নিতে পেরেছে। তবে তার ইচ্ছে ছিল প্রথম বাচ্চা নার্সিং হোমেই হোক। উমাপতি সেটা পেরে ওঠেননি। সেই অর্থবল তাঁর নেই। পঙ্কজ আর মনোজ যা পাঠায় তাতে কায়ক্লেশে সংসার চলে যায় মাত্র। সরোজ দুটো টিউশানি করে। উমাপতি নিজে দেশোদ্ধার করতেন বলে কোনওকালেই রোজগার বলতে তেমন কিছু ছিল না, তবে এম এসসি ডিগ্রিটা থাকায় বুড়ো বয়সে কয়েক বছর একটা কলেজে চাকরি করেছেন। তারপর একটা কারখানায় চেনাজানার সূত্রে ক্যান্টিনে সাপ্লায়ারের একটা সাব কন্ট্রাক্ট পান। পাঁউরুটি, ডিম আর কাঁচা সব্জী। খুবই অলাভজনক ব্যবসা। সরোজই ওটা দেখে। মাসে মাত্র শ দুই টাকা ঘরে আসে। এর জোরে মেয়েকে নার্সিং হোমে রাখার স্বপ্নও দেখা যায় না।

নাতিটা বেশ হয়েছে দেখতে। আঁতুরবেলায় এতটা বোঝা যায় না। তবে রং বোধহয় ফসাই হবে। মুখচোখে কোনও আদল আসেনি এখনও, তবে চোখ দুটো চন্দনার মতোই টানা টানা হবে।

বাবা, তোমার শরীরটা কি ভাল নয়?

কেন, বেশ তো আছি, সব ঠিক হ্যায়।

কেমন যেন দেখাচ্ছে তোমাকে।

বয়স তো হল রে। এখন তো কেবল ক্ষয়ের পাল্লা। ভাঙছে, একটু একটু করে ভাঙছে। ও নিয়ে ভাবিস কেন? আজ না হিমাংশু আসবে?

চন্দনা মুখটা ফিরিয়ে নিল। বলল, আসর তো কথা। শেষ অবধি দেখ ফের কোনও জরুরী কাজে আটকে গেল কিনা। ওকে ছাড়া তো প্ল্যান্টই অচল।

পতিগর্বে ভারী উজ্জ্বল হল মুখখানা। উমাপতি পরিতৃপ্তির সঙ্গে দেখলেন, একজন ইনজিনিয়ারের অভাবে কোনও প্ল্যান্টই কি অচল হয় আজকাল? কিন্তু তা না হলেই বা কি? অহংকারটুকু তবু ভালই লাগল উমাপতির। আহা এরকম অহংকার যদি তাঁকে নিয়ে কমলাবালারও থাকত?

বনস্পতিতে ভাজা পরোটা আর নিতান্তই কম তেল দিয়ে রাঁধা আলুর ছেঁচকি খুব উঁচু জাতের জলখাবার কিনা তার বিচারবোধ উমাপতি হারিয়ে ফেলেছেন। তবে এটা বুঝলেন যে, তার আদরের মেয়েটির মুখে খাবারটা রুচল না। কেমন নাক সিঁটকে, মুখটা তেতো করে একটু গিলল মাত্র। ইনজিনিয়ারের বউ, সুতরাং আজকাল ভালই খায়দায় নিজের বাড়িতে। জিবটাও জাতে উঠেছে। কিন্তু এই

www.boiRboi.blogspot.com

এতকাল নিজের বাপের বাড়িতে সেদ্ধপোড়া খেয়ে যে এত বড়টি হল সেই শিক্ষাটা গেল কোথায়? বনস্পতি বা রেপসিড্ যাই দিয়েই ভাজা হোক তবু তো পরোটা। এই পরোটাই যে ন'মাসে ছ'মাসে জুটত না এতকাল।

উমাপতি মেয়ের খাওয়ার ছিরি দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এর চেয়ে দুর্গাপুরে প্ল্যান্টের হাসপাতালে ভাল বিলিব্যবস্থায় চন্দনার বাচ্চা হলেই ভাল ছিল। মেয়ে এবং জামাইয়েরও তাই মত ছিল। উমাপতিও তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু কমলাবালা ভীষণ বেঁকে বসেছিলেন। প্রথমবারের বাচ্চা হওয়ার দায়িত্ব বাপের বাড়ি না নিলে নাকি মাথা কাটা যাবে। প্রায় সকলের অমতে এবং কমলাবালার জেদে মেয়েকে এই নরকে এনে ফেলতে হল।

বাঁচোয়া যে গোটা দুই সন্দেশ ছিল জলখাবারের সঙ্গে। একটা ডিমও। ফলে কিছুটা মানরক্ষা হল উমাপতির। আয়া টিফিন ক্যারিয়ারটা ধুয়ে দিলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

সকালের আয়াটি তার বাড়ির কাছের খাটাল থেকে সামনে দোয়ানো দুধ এনে দেয়। ছয় টাকা সের। গা চড় চড় করে উমাপতির। সেই দুধ খেতে খেতে চন্দনা ভ্রু কুঁচকে বলল, বাইরে একটা গণ্ডগোল হচ্ছে না?

উমাপতিও শুনলেন। কিছু চেঁচামেচি। হাসপাতালে অমন কত হয়।

পকেট থেকে আয়ার প্রাপ্য টাকা মেটালেন উমাপতি। চন্দনার ডেলিভারির জন্য পঙ্কজের কাছে বাড়তি কিছু টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। ছেলে পঞ্চাশ টাকা বেশি পাঠিয়েছে। খরচ চারশো ছাড়িয়েছে, আরও হবে। তবু ভাগ্যিস, চন্দনার নরম্যাল ডেলিভারি হয়েছিল। সিজারিয়ান হলে উমাপতির দুর্গতি ছিল।

বাবা, যাচ্ছো?

যাই।

তোমার জামাই এলে কী বলব বলো তো!

কী বলবি?

ধরো যদি কালপরশুই নিয়ে যেতে চায়? হয়তো ঠিক এই অবস্থায় রাখতে চাইবে না।

উমাপতি ঘাড় নেড়ে বললেন, ঠিকই তো। নিতে চাইলে যাবি। যাওয়াই তো উচিত।

চন্দনা খুশি হল। দুর্গাপুরে ওরা একটা বিশাল বাংলোয় থাকে। ঝি চাকর আছে, মালী আছে। জামাই বাবাজীবনের একখানা গাড়িও আছে। দেড় বছর হল খুব সুখের মুখ দেখেছে চন্দনা। বেচারাকে এই দুর্গতির মধ্যে এনে ফেলা ঠিক হয়নি। মোটেই ঠিক হয়নি। চন্দনার দুর্গতি, উমাপতির নিজের দুর্গতি।

কমলাবালা যে কেন এটা বোঝেন না।

বাবা, তাহলে আমি কিন্তু তোমার অনুমতি নিয়ে রাখলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

তোমার জামাই কিন্তু এবার শ্বশুরবাড়িতে উঠবে না। বলেই দিয়েছে।

উমাপতি তটস্থ হয়ে বললেন, তাহলে কোথায় উঠবে ?

ওর এক বন্ধুর বাড়িতে। পাইকপাড়ায়। বন্ধু অনেকদিন ধরেই বলছিল।

উমাপতি মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে।

জামাই মেয়ে এসে উঠলে ছোটো বাসাটায় দম ফেলার অবস্থা থাকে না। একবারই এসে উঠেছিল, সেই ঘিরাগমনে। তারপর আর আসেনি। মেয়েও এসে আজকাল থাকতে চায় না। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক ঠেকে উমাপতির কাছে। এরকমই হওয়ার কথা।

বলতে কি, এরকম হওয়াই ভাল।

আউটডোরে একটা লোককে আনা হয়েছে। পেট ফাঁক, মাথায় তিন ইঞ্চি ছ্যাঁদা, পেটে আর বুকে তিনটে গুলি। লাশই বলা যায়, তবে এখনও শ্বাস আছে। এক ভিড় লোক জুটেছে আউটডোরে। কয়েকজন উত্তেজিতভাবে চেঁচামেচি করছে।

উমাপতি ফের সেই অস্বস্তিটা টের পেলেন। কাল অবধি ভালয় ভালয় কেটেছিল। আজ আবার বোধহয় শুরু হল। ভিড়কে পাশ কাটিয়ে উমাপতি বেরোবার জন্য এগোলেন। আজকাল হাঙ্গামা দেখলেই সরে পড়েন। এ-সমাজের অন্তঃসারশূন্য মাৎস্যন্যায়ের চেহারাটা যত না দেখা যায় ততই ভাল। মানুষের যুক্তি এবং বুদ্ধি যখন শেষ হয়ে যায় তখনই সে খুন করে এবং করতে থাকে।

খুন উমাপতি নিজেও করেছেন। কিন্তু রাগের বশে বা স্বার্থের খাতিরে নয়। অনিলকে খুন করেছিলেন তাঁকে খুন করতে পার্টি নির্দেশ দিয়েছিল বলে। অনিলকে না মারলে সেদিন অনেকে ধরা পড়ত। আর কালীকে মারতে হয়েছিল নিজের প্রাণ বাঁচাতে। বন্দুক পিস্তলের সামনেও ঘাবড়ে না গিয়ে কালী তার সড়কি তুলেছিল।

সে সব কথা উমাপতি এখন ভুলে যেতে চান। বিচার করলে সব খুনই নিছক খুন। তাগিদ বা অজুহাত যাই থাকুক না কেন। উমাপতি আজ আর সেই সব কাজের জন্য পাপবোধে ভোগেন না বটে, কিন্তু মনে পড়লে কষ্ট হয়। অনিল বেঁচে থাকলে তাঁর বয়সীই হত, ছেলেপুলে নাতি-নাতনী হত। সুখে থাকত কিনা বলা মুস্কিল। তবে বংশ বিস্তার করত। কালী যখন মরে তখন তার সাতটা

www.boiRboi.blogspot.com

ছেলেপুলে, জমিজমা, ফলাও কারবার। ডাকাতি করার উপযুক্ত ঘর। তাই কালীর জন্য তত দুঃখ হয় না। তবু মনটা বিষণ্ণ হয়।

দাদু !

উমাপতি তাকিয়ে দেখলেন পাড়ার একটা ছোঁড়া ফটকের সামনে জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে। বাজারে ওর বাবার আলুর দোকান আছে, সেখান থেকেই আলু নেন উমাপতি। বললেন, কী রে ? এখানে কী ?

পান্টুর হয়ে গেল। আধমরা করে রেললাইনে ফেলে রেখেছিল।

পান্টু !

খুব রুস্তম ছিল। চেনেন না ?

চেনেন বৈকি উমাপতি। নামে ভালই চেনেন, এক আধবার দেখেছেন। এক সময়ে বড়ি বিল্ডার ছিল, পরে সহজ রোজগারে নেমে পড়ে।

উমাপতি বললেন, বাড়ি যা কখন কোন হাঙ্গামা লেগে পড়ে।

একটু দেখে যাই।

উমাপতি এগোলেন। আজকের দিনটাকে খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না তাঁর। একেবারেই সুবিধের নয়। শরীরটাও আজ মোটেই যুতের নেই।

বাড়ি ফিরে দেখলেন, নাতি দুটো আদুর গায়ে সদরে বসে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে করে মুড়ি খাচ্ছে। দু আড়াই বছর বয়স। দাদুর সঙ্গে বিশেষ বনে না, ঠাকুমার খুব বশ। তাঁকে দেখেই দু-জনে একসঙ্গে জিব ভেঙাল। ওরা এ রকমই। কোত্থেকে যে শেখে। কমলাবালাই হয়তো শেখান। রেগে গেলে তিনি প্রায়ই উমাপতিকে ভেঙান।

ঘরে এসে খোঁজ করে জানলেন, সরোজ এখনও ফেরেনি। বেশ অস্থির বোধ করলেন উমাপতি, পান্টুর খুন হওয়ার খবর হয়তো পাড়ায় তেমন ছড়ায়নি। কিন্তু ছড়ালেই মুস্কিল। উমাপতিকে এক কাপ চা দিল শ্রীময়ী। উমাপতি রবিবারে রেশন তোলেন। কিন্তু গতিক সুবিধের নয়, বন্ধ হতে পারে। তাই বললেন, রেশনটা তো তোলা হয়নি। দাও এইবেলা তুলে আনি।

শ্রীময়ী বলল, চা খান, আমি ব্যাগ টাকা গুছিয়ে দিচ্ছি।

কমলাবালা বাথরুমে। তাই নিশ্চিন্তে চা খেতে খেতে উমাপতি ভাবলেন, সে আমলে কন্ট্রাসেপটিভের এত চলন ছিল না। অনেকে বুঝতই না ব্যাপারটা কী। সেই আমলে উমাপতি একদিকে যেমন স্বদেশী করেছেন তেমনি সন্তানের ফলনও কম হয়নি তাঁর, নয়টি হয়েছিল। পাঁচটি গেছে। তারা থাকলে উমাপতির দুর্গতি বাড়ত বৈ কমত না। আরও অভাব আরও দুশ্চিন্তা। কোনটা কি রকম হত কে বলবে। যে চারটি আছে তাদের নিয়েও কি কম ভাবনা ?

আবার পান্টুর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বহুকাল আগে তাঁর একটা জারমান মাউজার পিস্তল ছিল। অনিলকে যেটা দিয়ে মারেন। দেশ স্বাধীন হলে সেটা সরকারে জমা দেন। থাকলে বেশ হত। আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্ত্র থাকা ভাল।

॥ দুই ॥

আজ প্রেস কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী বেশ ভাল মুডে ছিলেন। অনেক পয়েন্টেই কথা বললেন তিনি। বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত, ত্রিপুরা ও আসামে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ, উপজাতি সমস্যা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, ওভার ড্রাফট্। ফাঁকে ফাঁকে নিজের বয়স, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা এবং কলকাতায় জঞ্জাল নিয়ে লঘু রসিকতাও ছিল। স্বভাবত গম্ভীর মুখ্যমন্ত্রী সহজে হাসিঠাট্টা করেন না। আজ মুড ভাল ছিল। সাংবাদিকরা জানেন, মুখ্যমন্ত্রীর মেজাজ ভাল থাকাটা একটা বিরল ব্যাপার।

জিজা বিশেষ প্রশ্ন করেনি। মাত্র দুটো। সে রীতিমত ছুকরি সাংবাদিক, এখনও ততটা সাহস হয়নি তার যে পটাপট প্রশ্ন করে মন্ত্রীদের রং ফুটে ফেলে দেবে। তার প্রথম প্রশ্ন ছিল, এই রাজ্যে আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা অন্য রাজ্যের চেয়ে ভাল বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন কিনা। এলেবেলে প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, করি। এ রাজ্যের অবস্থা অনেক ভাল। জিজার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল গৃহবধূ হত্যা নিয়ে। আজকাল বউ খুনের একটা হাওয়া এসে গেছে নাকি? মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিলেন এবং সরকার এ ব্যাপারে যা যা করছে তা জানালেন। পুরানো প্রশ্ন এবং যথারীতি সনাতন উত্তর।

কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির বেলায় গ্রেগরি পেক, অর্থাৎ টুলু চৌধুরি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গৃহবধূ হত্যা, নারী হত্যা ইত্যাদি আলাদা ইস্যু হওয়া উচিত নয়। এতে পুরুষেরা এবং বিশেষত স্বামীরা খুবই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এখন এমন হয়েছে যে, স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলেও স্বামীরা ফেরার হন।

এতে সকলেই হেসে উঠল। এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর মুখেওএকটু কৌতুক খেলা করে গেল।

জিজার কিন্তু লাল হয়ে উঠল মুখ। সে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, ব্যাপারটাকে লাইট করাটা মোটেই উচিত নয়। খুনটা রসিকতার ব্যাপার নাকি?

টুলু চৌধুরি কথাটা শুনে জিজার দিকে একটু তাকাল, জিজা চোখ সরিয়ে নিল।

একজন সাংবাদিক হাওড়ার জঞ্জাল এবং সমাজবিরোধী নিয়ে প্রশ্ন করল।

www.boiRboi.blogspot.com

কালকেও একজন খুন হয়েছে এবং দু'দল থেকেই দাবী উঠেছে যে, নিহত ব্যক্তি তাদের সমর্থক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আর সময় দিতে পারলেন না। তাঁকে বিকেলে দিল্লির ফ্লাইট ধরতে হবে।

জিজা প্যাড আর ডটপেন ব্যাগে ভরে ফট করে ব্যাগের মুখ আটকাল। আড়চোখে লক্ষ্য করল, টুলু চৌধুরি উঠে দাঁড়িয়েছে, লম্বায় ছ' ফুট এক ইঞ্চি, মেদহীন রুক্ষ শক্ত চেহারা, চোখে-মুখে বুদ্ধির ঝিকিমিকি, অবিকল গ্রেগরি পেক-এর মতোই পেটানো মুখশ্রী। এমন বিরল পুরুষালী সৌন্দর্য খুব কম চোখে পড়েছে জিজার। বিশেষত চল্লিশোর্ধ কোনও ভুঁড়িহীন মানুষ আজকাল সে দেখেই না। টুলু চৌধুরি অনেক মেয়ের মাথা খেয়েছে এবং বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আরও অনেকের মাথা খাওয়ার জন্য জিব দিয়ে ঠোঁট চাটছে। জিজা সবই জানে। আর সে এটাও টের পায়, টুলু চৌধুরিকে দেখলেই তার বুকের ভিতরটা দপ করে উঠে, গায়ে একটু শিহরণ দেয়। অথচ লোকটাকে সে প্রাণপণে ঘেন্না করতে চেষ্টা করে।

বেরোবার মুখে টুলু এসে ধরল, জিজা, তোমার গাড়ি আছে?

জিজা না তাকিয়ে বলল, আছে।

আমার গাড়িটা ছেড়ে দিতে হল, একটা লিফট দেবে?

গাড়ি ছেড়ে দিলেন কেন? আমি তো ছাড়িনি।

আরে ভাই, তোমার অফিসের কথা আলাদা, দেদার গাড়ি ওদের। আমার গরীব অফিস, গাড়ির খুব টানাটানি।

আসুন, পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

আমি অফিসে যাবো না। করপোরেশনে।

সন্দিহান জিজা বলল, সেখানে কী?

টুলু অভয় দিয়ে বলল, নো স্কুপ, নাথিং। যাবো নিজের কাজে।

যে সব পুরুষ খুব ল্যালার মতো কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করে মেয়েরা তাদের মোটেই পছন্দ করে না। ল্যালা পুরুষ দেখলেই জিজার অ্যালার্জি হয়। কিন্তু টুলু চৌধুরির এই গায়ে-পড়া ভাবটাকে অপছন্দ করলেও ঠিক ততটা ঘেন্না করতে পারল না জিজা। লোকটার চেহারা সুন্দর বলে নয়, এ লোকটার মধ্যে কোথাও একটা ধিকিধিকি আগুন ছিল। সেটা এখন আর নেই। নিবে গেছে। শুধু উনুন নিবে গেলেও যেমন অনেকক্ষণ গরম আঁচটা থাকে অনেকটা সে রকমই কিছু। এ লোকটা এক সময়ে ভারতবর্ষের গাঁ-গঞ্জে পায়ে হেঁটে পাগলের মতো ঘুরেছে, বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করেছে লোকসেবা সংগঠন। লোকটা ঘুরেছে মঠে মন্দিরে আশ্রমে তীর্থে। কিসের একটা অন্বেষণ ছিল টুলু চৌধুরির, এবং যতদিন সেটা

ছিল ততদিন লোকটা ছিল সন্ন্যাসী-উদাসীন-বৈরাগী এক মানুষ। সবই শোনা কথা জিজার। ওই বৃহৎ জীবন থেকে কেন টুলু চৌধুরি আবার সংকীর্ণতায় গণ্ডীবদ্ধ করল নিজেকে তা বিশেষ জানা যায় না, তবে আগুন ছিল, সন্দেহ নেই।

জিজা গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলল, উঠুন।

টুলু উঠল, জিজা তার পাশে বসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, সল্ট লেক-এ আপনার বাড়ি হচ্ছে না?

টুলু মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, তুমি জানো দেখছি।

শুনেছিলাম। কে যেন বলছিল, জমিটা অনেকদিন আগে আপনি একটা ট্রাস্টের নামে কিনেছিলেন। বোধহয় অনাথ আশ্রম বা ও রকম কিছু করবেন বলে।

টুলু চৌধুরি কথাটা শুনল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু বাইরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল।

একটু কষ্ট হল জিজার। কথাটা অমন মুখের ওপর না বললেই হত। কিন্তু লোকটাকে একটু আঘাত দেওয়ার লোভও সে সংবরণ করতে পারল না। দুনিয়াটা পচে গেছে বটে, কোনও মানুষই এখন আর শতকরা একশ' ভাগ সৎ নেইও বটে, কিন্তু আজও জিজা কোনও মানুষের মধ্যে সততার অভাব দেখলে চটে যায়।

টুলু খানিক বাদে মুখ ফিরিয়ে বলল, ট্রাস্ট বানচাল হয়ে গেছে। যা করতে চেয়েছিলুম তা হল না। জমিটা আমার নামেই কেনা ছিল।

জিজার উচিত ছিল চুপ করে থাকা। কিন্তু নিজেকে সামলাতে না পেরে সে বলল, কিন্তু জমি কেনার টাকাটা দিয়েছিল পাবলিক। আপনি চাঁদা এবং দান নিয়েছিলেন।

এই আক্রমণেও টুলু ধৈর্য হারাল না। খুব শান্ত মুখশ্রী নিয়েই বসে রইল সে। মৃদু স্বরে বলল, সবটাই নয়। জমির দামের অর্ধেক আমি দিয়েছিলুম। বাকি অর্ধেক ডোনেশন। সেই জন্য পুরো জমিটায় আমি বাড়ি করছিও না। অর্ধেকটা বাদ রাখছি। কিন্তু এত খবর তোমাকে দিল কে?

খবরটা তো খুব সিক্রেট নয়। অনেকেই আলোচনা করে।

টুলু চৌধুরি খুব মৃদু স্বরে বলল, না, বলাবলি করে না। তার কারণ খবরটা প্রায় কেউই জানে না। তুমি খুব ভাল রিপোর্টার হবে জিজা। নিশ্চয়ই তোমার হাই কানেকশনস আছে, নইলে এ খবরটা তুমি পেতে না।

জিজা তার বব চুলওয়ালা মাথাটা খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটু ঝাঁকিয়ে বলল, টুলু চৌধুরি কে এবং সে কোথায় বাড়ি করছে আর কার জমিতে, তা নিয়ে

কারও মাথাব্যথা নেই। আমি জাস্ট একটা গসিপ শুনেছিলাম। আপনি কর্পোরেশনে যাচ্ছেন শুনে হঠাৎ মনে হল, হয়তো ওই বাড়ির ব্যাপারই হবে।

টুলু চৌধুরি হয়তো ভাবল, জিজার গাড়িতে ওঠাই আজ তার ভুল হয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর মুখটা জিজার দিকে ঘুরিয়ে বলল, তোমার গাটস আছে জিজা। ভাল রিপোর্টার হতে গেলে ওটা খুব দরকার।

জিজা অম্লানবদনে বলল, আপনার গাটস অনেক বেশি। নইলে পাবলিকের টাকায় ট্রাস্টের জমিতে নিজের বাড়ি করতে পারতেন না। কিন্তু অত গাটস থাকা সত্ত্বেও তো আপনি তেমন ভাল রিপোর্টার নন।

রোজ যেমন সংলাপ বা চাপান-ওতোরে টুলু অভ্যস্ত জিজা তা থেকে অনেক দূরে এনে ফেলেছে তাকে। এত অকপটে, প্রায় বিবেকের সংলাপের মতো স্পষ্টাস্পষ্টি তার মুখের ওপর কেউ তো এরকম সব কথা বলে না। কাজেই বাক্য খুঁজে পেতে টুলুকে প্রায় মিনিটখানেক অপেক্ষা করতে হল। এবং অবশেষে যে বাক্যটা সে খুঁজে পেল সেটাও পানসে এবং জোলো। তার স্বভাবত ভাবলেশহীন এবং আত্মসন্তুষ্টির হাসি মাখানো মুখখানা বেশ টকটকে হয়ে উঠল। রীতিমত ক্রুদ্ধ গলায় সে বলল, জিজা, ইউ আর গোয়িং টু ফার।

জিজা শিশুকাল থেকে এক রাগী ও চণ্ড পুরুষের ছায়ায় বড় হয়েছে। পুরুষের রাগকে সে বড় একটা ভয় পায় না। সে একটু হেসে খুব নরম গলায় বলল, অবশ্য আপনি কিছু মনে করে থাকলে আমি দুঃখিত। কিন্তু টুলুদা, এসব কথায় আপনি রেগে যান কেন? যারা অন্যায় করে তারা তো মান-অপমান গায়ে মাখে না, ইমিউন হয়ে যায়। আপনি এখনও হতে পারেন নি?

টুলু এবার সত্যিই বাক্য খুঁজে পেল না। বার দুই ব্যর্থ হাঁ করে মুখ বুজে ফেলল।

জিজা খুব সমবেদনার গলায় বলল, আপনি সিগারেট খেতে পারেন। আমার অসুবিধে হবে না।

টুলু একথায় একটু যেন সচকিত হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে অত্যন্ত নার্ভাস হাতে ধরাল। সিগারেটের কথা সে ভুলে গিয়েছিল।

জিজা পিছনে মাথা হেলিয়ে চোখ আধবোজা করে সামনের উইণ্ডস্ক্রিনের ভিতর দিয়ে এক অসহনীয় জ্যামের দৃশ্য দেখতে লাগল। এসপ্ল্যানেডের চৌমাথা পার হয়ে সুরেন ব্যানার্জি রোডে ঢোকা যেন এ জন্মে আর সম্ভব হয়ে উঠবে না। জিজা চোখ তুলে ড্রাইভারের মাথার ওপর ছোট্ট আয়নাটার মধ্যে টুলু চৌধুরিকে দেখল। সত্যিই অসাধারণ এক পাশ্চাত্য মুখশ্রী। তার ওপর নিজেকে প্রদর্শন

www.boiRboi.blogspot.com

করার আর্টটিও এই লোকটির জানা। তেলহীন ঈষৎ রুক্ষ লম্বা চুল কপালের সিকিভাগ ঢেকে ঢেকে টেনে ডানদিকে আঁচড়ানো। কয়েকটা পাকা চুল জাহির আছে, টুলু তাতে কলপ দেয়নি বা তুলে ফেলেনি। কারণ অল্প পাকা চুল অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সংমিশ্রণ ঘটায় এবং পুরুষের যৌন আকর্ষণ বাড়ায় বলে জিজার ধারণা। টুলু সেটা জানে। টুলুর গায়ে খুবই ফিকে চওড়া হরেক রঙের স্ট্রাইপ দেওয়া একটা টি শার্ট। খুব টাইট ফিটিং নয়। তাতে ফিগারটা বেশ চওড়া দেখাচ্ছে। বাঁ হাতে রীতিমত দামী একখানা ঘড়ি। খুব যে সেজেছে তা নয়, কিন্তু বেশ নিপুণভাবে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে। অবশ্য এখন জিজার দ্রুতগতি বলের মোকাবিলা করতে না পেরে বেকুব ব্যাটসম্যানের মতো মুখ করে বসে আছে টুলু। রিক্ত, ব্যক্তিত্বহীন, অস্থির।

সেই অস্থিরতা থেকেই বোধহয় হঠাৎ বলল, জিজা, আমি নেমে যাচ্ছি। এটুকু হেঁটে চলে যাবো। কাছেই তো।

জিজা মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

অফিসে এসেই প্রথমে বাথরুমে গেল জিজা। মুখে জলের ঝাপটা দিল। ঘাড়ে আর কানের পিঠ জলে ভিজিয়ে নিল। জল দিয়ে মুখ ধোয়াই হল জিজার একমাত্র রূপের পরিচর্যা। সে কোনও রূপটান ব্যবহার করে না। লিপস্টিক, স্নো, পাউডার কিছু না। শুধু শীতকালে চামড়া ফাটে বলে ক্রিম লাগায়। রূপটান ব্যবহার করে না বলেই যখন তখন মুখে জলের ঝাপটা দিতে পারে সে। তার চুল বব করা, কিন্তু সেটা ফ্যাশানের জন্য নয়। বড় চুলের জন্য কিছু ঝক্কি পোয়াতে হয়, বব বা বয়কাটে ঝক্কি অনেক কম। সে কখনও সখনও শাড়ি পরে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তার পরনে থাকে হ্যাণ্ডলুমের হাফহাতা কুর্তা আর জিনসের প্যান্ট। পায়ে হকি বুট। তার কানে, গলায়, হাতে দুল, হার চুড়ি বা বালা নেই। বাঁ হাতে একখানা কমদামী ডিজিট্যাল ঘড়ি আছে মাত্র। তার নখ স্বাভাবিকভাবে কাটা এবং তাতেও কোনও নেলপালিশ নেই। কিন্তু এতটা বঞ্চিত করেও নিজের শরীর এবং মুখশ্রীকে সে রূপহীনা করতে পারেনি। জিজার উচ্চতা খুব বেশি নয়, পাঁচ ফুট এক বা দুই ইন্‌চি। সে বেশ ছিপছিপে। রং ফর্সাই বলা যায়। যা প্রথমে চোখে পড়ে তা হল তার মেদহীন শরীরের একটা সতেজ লকলকে ভাব। তার মুখ যতটা সুন্দর ততটাই ধারাল এবং তীব্র। কমনীয়তার যে অভাবটুকু রয়েছে তা ওই তীব্রতার জন্যই। দুটো চোখ যথেষ্ট আয়ত, কিন্তু আবার সেখানেও সেই ধার, সেই তীব্রতা। মিস ক্যালকাটা প্রতিযোগিতায় নামলে জিজা অনায়াসে ফাইন্যালে পৌঁছোবে, কিন্তু মিস ক্যালকাটা হতে পারবে না কখনও। কারণ তার মধ্যে লাস্যময়তা আর

www.boiRboi.blogspot.com

কমনীয়তা এই দুই বস্তু নেই। জিজার মধ্যে মেয়েমানুষী কম থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে সে তার বাবার হাতে মানুষ। তার বাবা শুভঙ্কর রায় টাটার ইনজিনিয়ার। অল্প বয়সে তার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটার পর শুভঙ্কর তার শিশু কন্যাটিকে বুক দিয়ে বড় করে তোলে। পাছে মেয়ের অযত্ন হয় বা সৎ মা এসে অত্যাচার করে সেই ভয়ে সে আর বিয়ে পর্যন্ত করেনি। শুভঙ্কর যথেষ্টই পুরুষালী পুরুষ। এক সময়ে বকসিং লড়ত, টেনিস সে এখনও খেলে, প্রচণ্ড সাহসী এবং একটু মস্তান গোছের লোক। রেগে গেলে সে আজও যাকে তাকে ধরে পেটায়। সেই শুভঙ্করের যাবতীয় স্নেহ ভালবাসা জড়ো হয়েছিল মেয়ের ওপর। আর মেয়েও বড় হল নিজেকে বাবার আদলে ঢেলে দিয়ে। একটু বড় হওয়ার পর জিজা তার বাবার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং শুভঙ্কর খুব বশংবদ হয়ে মেয়ের আধিপত্য মেনেও নেয়। তাই জিজা যখন কলকাতায় চাকরি করতে আসতে চাইল তখন শুভঙ্কর বিষণ্ণ হলেও বাধা দিল না। সে জানে, মেয়ে চিরকাল কারও নিজের থাকে না। পর হওয়ার জন্যই ওই কোকিল ছানারা আসে।

কথা হল, জিজা জানে যে সে অনেকটাই তার বাবার মতো। সেও প্রচণ্ড সাহসী, বড় একটা কারও তোয়াক্কা করে না, মেয়েমানুষী ন্যাকামি তার মধ্যে নেই। তা বলে সে পুরুষালী মেয়েও নয়। একটু অন্য রকম মেয়ে। আর সে যে অন্য রকম মেয়ে এটা মোটামুটি পুরুষেরা সময় মতোই আঁচ পেয়ে যায়। তাই বড় একটা কেউ তাকে ঘাঁটায় না বা তার কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করে না। যারা করে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।

মুখ ধুয়ে একটা বড় রুমালে ঘাড় গলা মুখ মুছে জিজা নিউজ রুমে এসে চটপট টাইপ রাইটারে বসে গেল রিপোর্ট লিখতে। ছাত্রী হিসেবে সে দারুণ ভাল ছিল; রিপোর্টার হিসেবেও কিছু খারাপ নয়। সে মনোযোগী, বুদ্ধিমতী, চক্ষুষ্মতী। কাজেই, আত্মবিশ্বাস প্রবল।

রিপোর্ট লিখতে এক ঘন্টার মতো লাগল। তারপর ব্যাগ থেকে একখানা পেপার ব্যাক বের করে পড়তে বসে গেল সে।

রোজই পড়ে। কখনও কনসেনট্রেশনের অভাব হয় না। কিন্তু আজ হল। বার বার টুলু চৌধুরির কথা মনে পড়ছিল। লোকটাকে সে আজ হালকা রকম অপমান করেছে। কিন্তু মুস্কিল হল, ওই বিবাহিত এবং তার প্রায় ডবল বয়সের পুরুষটির প্রতি জিজার একটা ব্যাখ্যার অতীত আকর্ষণও কাছে। আজ অবধি ঠিক এ রকম আকর্ষণ সে আর কারও প্রতি বোধ করেছে বলে মনে পড়ে না। লোকটাও কি তার প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করে?

গডফাদার এসে জিজার ডেস্কের পাশে দাঁড়ালেন। মুখে সেই অতি

সজ্জনসুলভ হাসি।

রিপোর্টটা ভালই হয়েছে। গৃহবধূ-হত্যার প্রসঙ্গটা কে তুলেছিল ? তুমি নাকি ?

জিজা একটু লাজুক মুখে বলল, হ্যাঁ।

তা ওটাই হাইলাইট করলে না কেন ? ইকুয়্যালি সিরিয়াস প্রবলেম।

আমি ভাবছিলাম আসাম ইজ মোর সেনসিটিভ কোশ্চেন।

আরে ও নিয়ে তো রোজ হচ্ছে। আচ্ছা, এরকমই থাক। এডিট যা করার তা নিউজ থেকেই করবে। কাল তোমার কখন ডিউটি জিজা ?

সকালে।

গডফাদারকে সামান্য চিন্তিত মনে হল। ভ্রূ কুঁচকে একটু চিন্তা বা দুশ্চিন্তা করতে করতে আপনমনে একটা সুরহীন "হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ" শব্দ করে যেতে লাগলেন। গডফাদার কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শব্দটা করেন। ওটা গান হতে পারে, গানের ক্যারিকেচার হতে পারে। একসময়ে শব্দটা থামিয়ে বললেন, একটা মুস্কিল হয়েছে।

কী মুস্কিল ?

আমি তোমাকে কখনও কোনও বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাইনি। কিন্তু এখন আমার হ্যাণ্ড বড্ড শর্ট। তিনজন রিপোর্টার জণ্ডিসে পড়ে আছে। দুজন লম্বা ছুটিতে। দুজন বাইরের অ্যাসাইনমেন্টে। অথচ হাওড়ায় একজন কাউকে না পাঠালেই নয়।

জিজা একটু অবাক হয়ে বলল, তাতে কী আছে ! আমি পারব।

আমি একটু ওল্ড স্কুলের লোক, বুঝলে জিজা। মেয়েদের যে কোনও কাজে লাগানোটা আমার আনএথিক্যাল মনে হয়।

আপনি আমার যোগ্যতায় সন্দেহ করেন না তো !

আরে না না, কী যে বলো। তুমি তো বেশ স্মার্ট। কিন্তু আফটার অল মেয়ে তো ! আর হাওড়ায় যা ঘটছে। সেসব সমাজবিরোধীদের কাজ ! ছোরাছুরি বোমা-পিস্তল চলছে, সেখানে তোমাকে পাঠানো-মানে—তুমি আমার মেয়ে হলে আমি পারতাম না।

জিজা একটু হেসে বলে, কিন্তু আমার বাবা আপনার জায়গায় হলে ঠিক আমাকে পাঠাতেন।

গডফাদার আবার হাসলেন। সজ্জনের অপ্রতিভ ঠাণ্ডা হাসি। বললেন, তাহলে কাল সকালে তুমি স্ট্রেট হাওড়ায় চলে যেও। অ্যাট ইওর ওন টাইম। সেখান থেকে অফিসে ফিরে রিপোর্ট লিখো। পারবে তো ! ভেবে দেখ এখনও।

জিজা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হেসে বলল, কলেজে থাকতে কতবার পুলিশের সঙ্গে মারদাঙ্গা করতে হয়েছে। সোডার বোতল আর ইঁট ছুঁড়েছি কত। ইউনিয়নে-ইউনিয়নে বহু ফাটাফাটি হয়েছে।

গডফাদার একটু শিউরে উঠলেন বলে মনে হল জিজার। গডফাদার অবশ্যই জানেন যে, দুনিয়াটা ধীরে ধীরে গোল্লায় যাচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের বার্তা সংগ্রহের প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে সব খবরই জড়ো হয়। কিন্তু তিনি সেগুলো সব মেনে নিতে পারেন না। তাঁর ছাত্রজীবনে মেয়েরা অতিশয় সুশীলা ছিল, ভারী লজ্জাবতী। এই প্রজন্মের মেয়েদের যে মেয়ে বলে ভাবতেই কষ্ট হয়।

গডফাদারের ব্যথিত মুখ দেখে জিজা করুণাভরে বলল, আপনি ভাববেন না, চিত্তদা, আমি পারব। কোনও বিপদে পড়ব না।

গডফাদার কথা বলতে পারলেন না। শুধু মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে এবং একটি মেয়েকে বিপজ্জনক কাজে পাঠানোর লজ্জায় অধোবদন হয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন। জিজা দৃশ্যটা দেখে একটু হাসল। এক নিজের স্ত্রী ছাড়া জগতের আর সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে চিত্ত ঘোষের একটাই সম্পর্ক মাত্র। বাবা আর মেয়ে। তাই আড়ালে মেয়েদের কাছে উনি গডফাদার, সামনে চিত্তদা।

॥ তিন ॥

যদি কেউ বলে যে, শুভেন বসুর কোথাও জীবনদর্শন বা ফিলজফি নেই, তাহলে সে খুব ভুল করবে। শুভেন বসুর কেন, দুনিয়ার সব মানুষেরই একটা না একটা জীবনদর্শন থাকবেই। যদি কেউ বলে "না মশাই, আমার কোনও ফিলজফি-টফি নেই" তাহলে ধরে নিতে হবে যে, ওটাই তার ফিলজফি। শুভেন বসুর ক্ষেত্রে অবশ্য তা নয়। তার জীবনদর্শন তো আছেই, বরং কখনও সখনও মনে হয় তার জীবনদর্শনের সংখ্যা একটু বেশি এবং এক এক সময় এক এক অবস্থার চাপে এক এক রকম। কলেজে পড়ার সময় শুভেন বামপন্থী রাজনীতি করত এবং ইউনিয়নের সেক্রেটারি অবধি হয়েছিল। সেই সময় সে বিখ্যাত রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ প্রকাশ গাঙ্গুলির প্রায় তলপিবাহক ছিল। প্রকাশ গাঙ্গুলি সক্রিয় রাজনীতি করেন না বটে, কিন্তু দলে তাঁর একটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার স্থান আছে। পড়াশুনোর অসুবিধে হবে—এই ভয়ে তিনি বিয়ে অবধি করেননি। পৈতৃক বাড়িটা ভাইদের পুরোটা ভোগ করতে দিয়ে নিজে একতলার একখানা ঐদো ঘরে দিনরাত পুঁথিপত্রের মধ্যে ডুবে থাকতেন। অনেক বড় বড় নেতার তাঁর কাছে যাওয়া-আসা। তাঁর মুখের কথার অনেক দাম। লোকে বলে, শুভেন

www.boiRboi.blogspot.com

বসু বৃহত্তর রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যই প্রকাশ গাঙ্গুলির কাছে যাওয়া-আসা করত। বলতে গেলে একরকম তাঁর পুষ্যিপুত্তুরই হয়ে উঠেছিল। বন্ধুরা অবশ্য তাকে বলত, ও লোকটার কাছে যাসনে, লোকটা হোমো। কথাটা মিথ্যে। প্রকাশ গাঙ্গুলির শরীর-বোধ ছিল না। তত্ত্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে লোকটা হয়ে গিয়েছিলেন তত্ত্বের মতোই রসকষহীন, ছিবড়ে। তবে ঝানু লোক। শুভেনকে স্নেহ করলেও তোল্লাই দেননি। একটু নেড়েচেড়েই বুঝতে পেরেছিলেন যে, একে দিয়ে তেমন কিছু হবে না।

প্রকাশ গাঙ্গুলিকে ধরে করে কিছু না হওয়ার মধ্যেও একটা কিছু হয়েছিল শুভেনের। সে মার্কসবাদ সম্পর্কে খামচা খামচা করে কিছু শিখেছিল। ইচ্ছে করলে আরও জানতে বা শিখতে পারত, কিন্তু সেই ধৈর্য বা সময় তার ছিল না। অনেকেরই ধৈর্য এবং সময় থাকে না বলে মার্কসবাদ বা গান্ধীবাদ বা অন্যান্য বাদ শেষ অবধি শেখা হয়ে ওঠে না। তবে শুভেন একটা মোদ্দা কথা শিখে নিয়েছিল যে, সর্বহারার বিপ্লব ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। আর একটা কথাও ছিল তার মনোমতো, শ্রেণীশত্রু। যা হোক, কয়েকটা কথা এবং বিশেষ কয়েকটা শব্দ সম্বল করে শুভেন চারদিকটাকে বড় কম গুঁতোয়নি। যারা কষ্ট করে মার্কসবাদ জেনেছে বা শিখেছে তারা শুভেনের সামনে রীতিমত লজ্জায় পড়ে যেত। কারণ, শুভেন ভুলভাল জানলেও যা বলে তা বেশ জোরের সঙ্গে বলে এবং বেশ গুছিয়েও। কারণ শুভেন জানে যে, সে কাজ করে বেড়াবে অলিতে গলিতে পানবিড়িঅলাদের কাছে, কুলি ধাওড়ায়, কারখানার রগচটা এবং মদ্যপ শ্রমিক, চোর গুণ্ডা পকেটমারদের কাছে, তার অত সব না জানলেও চলবে। তাছাড়া তার তখন দ্রুতগতির উন্নতি প্রয়োজন। অতএব ভ্যানতাড়া শিখতে গেলে চলবে কেন?

বলাই বাহুল্য শেষ অবধি কঙ্কে পায়নি সে। কিছুদিন খিদমদগারী করে নেতা হওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সে দলটা পাল্টে ফেলল। দ্বিতীয় দলে তখন বেশ কয়েকজন বুড়োটে নেতা হাল ধরে আছে এই এলাকায়। শুভেন বেছে বেছে ভিড়ল উমাপতির সঙ্গে। এক সময়ে সে উমাপতির মেয়ে চন্দনাকে বিয়ে করবে বলেও স্থির করেছিল। শেষ অবধি ততটা গড়ায়নি। উমাপতির মেয়েকে বিয়ে করলে তার পলিটিক্যাল গেন কিছুই হত না। কিছুদিন পরেই বুঝল, লোকটা খিটকেলে এবং কেমন যেন পলিটিকসে গা নেই। আরও কয়েকজনের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াল সে। কেউ তেমন পাত্তা দিল না।

তবে হাল না ছেড়ে সে ছোটখাটো দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগল। ছোট দলে প্রাধান্য পাওয়া সোজা। জনগণের কাছে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল

www.boiRboi.blogspot.com

করতে সে প্রায়ই গিয়ে এসপ্লানেড ইস্টে কোনো ছুতোয় গ্রেফতার বরণ করত আর তখন তার দলের ছেলেরা পাড়ার দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় পোস্টার সাঁটত : "শুভেন বসুর মুক্তি চাই," "শুভেন বসুর ওপর পুলিশী নির্যাতন চলবে না," "জনগণ শুভেনের সঙ্গে আছে," "শুভেন বসু যুগ যুগ জিও," ইত্যাদি। কিন্তু মজা হল, এসব পোস্টার যখন সাঁটা হত তার অনেক আগেই শুভেন বসুকে বা আরও অনেককে পুলিশ নির্জন ময়দানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত।

শুভেন বসু চায় সকাল ছটা থেকে রাত বারোটা অবধি জনগণের সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে। শুভেন বসু আরও চায়, জনগণের মানসলোকের রাজপুত্র হতে। তার আকাঙ্ক্ষা, জনগণকে সম্পূর্ণ সম্মোহিত করে ফেলা।

এগুলোর কোনওটাই এখনও সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু শুভেন তা বলে হাল ছেড়ে দেয়নি। সে সর্বদাই সুযোগের অপেক্ষা করে এবং সবরকম ঘটনাতেই নিজেকে যথাসাধ্য প্রোজেক্ট করার চেষ্টা করে। মারপিট, ধর্মঘট, আন্দোলন, মিছিল, বয় স্কাউট, মণিমেলা, রক্তদান শিবির, চক্ষুদান, প্রকল্প, কিছুই সে বাদ দেয় না। সে গোটা পঞ্চাশেক ছেলে ছোকড়া জুটিয়ে একটা ঘোঁট পাকিয়ে নিয়েছে।

শুভেন একটা কলেজে অধ্যাপনা করে। তার বউও সেই কলেজেরই অধ্যাপিকা। শুভেনের বাবার তেমন পয়সা না থাকলেও শ্বশুর কালোয়ার। সংসার নিয়ে তার তেমন ভাবনা নেই।

পাণ্টুর খুন হওয়ার খবরটা পেয়েই তিন লম্ফে শুভেন গিয়ে অকুস্থলে হাজির হয়। সে-ই পুলিশকে খবর দিয়ে লাশ হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। তারপর খবরটা দিয়ে আসে বিভিন্ন খবরের কাগজের অফিসে। পাণ্টুর ফ্যামিলিতে খবরটা পৌঁছে দেয় সে-ই।

সুপারম্যান, টারজান, স্পাইডারম্যান, শ্যানটম এদের যে অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে তা নিতান্তই গাঁজাখুরি গপ্পো বটে, কিন্তু শুভেনের ওরকমই সুপার-সুপার কিছু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের। লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি হওয়া সত্ত্বেও সে একদা সুপারম্যান বা টারজান হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় প্রবল মনোযোগে ব্যায়াম করেছে। ঘুঁষি দিয়ে তিনটে লোককে ঘায়েল করার কৃতিত্ব অর্জনের জন্য বকসিং ক্লাবে ভর্তি অবধি হয়েছিল। কিছুদিন জুডো ক্লাবেও। কিন্তু সেই রোগাভোগা ক্ষিন্ন চেহারাটা পাল্টায়নি। শুভেন এও জানে, জন্মসূত্রে যে-শরীর এবং যে-মগজ সে পেয়েছে তা দিয়ে সুপারস্টার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাতুলতা মাত্র। তবে সে আশা করে এবং ঈশ্বরের কাছে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে প্রার্থনা

করে, তার ওপর একটা ভরটর কিছু হোক। যেমনটা সেই প্রমথ চৌধুরির মন্ত্রশক্তি গল্পের নায়ক ঈশ্বরের হত। নিশুতরাতে ছাদে গিয়ে বসে ধ্যানস্থ থেকেছে শুভেন, রাত বিরেতে মফস্বলের শ্মশানে গিয়ে সাধুদের ভজানোর তাল করেছে, তান্ত্রিক জ্যোতিষ কিছুই গোপনে বাদ রাখেনি। বহু-প্রত্যাশিত সেই ভর আজও হল না।

পাণ্টুর মার্ডারটাকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানো যায় কিনা এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে শুভেন এসে মালাধরের দোকানে বসে চা খেতে লাগল। দোকানে সরোজ ছাড়া তৃতীয় খদ্দের নেই।

শুভেন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, খবর শুনেছিস ?

সরোজ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, কোন্ খবর ?

পাণ্টু। পাণ্টু কাল খুন হয়ে গেল।

সরোজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। খুব উদাসীন মুখ করে বলল, ও। ও তো রোজই হচ্ছে, নতুন কী ?

কথাটা মিথ্যে নয়। খুনখারাপী রোজই হচ্ছে বটে, কিন্তু যারা খুন হচ্ছে তারা সবাই শুভেনের চেনা নয়। পাণ্টু চেনা। আর পাণ্টু মস্তানও বটে।

সরোজ বোধহয় নামটা ঠিকমতো শুনতে পায়নি, এই ভেবে শুভেন আবার বলল, আরে পাণ্টু—মানে সেই বড়ি বিল্ডার।

সরোজ মুখ তুলে মৃদু একটু হাসল। তারপর বলল, চিনি। টিকেপাড়ার পাণ্টু। কালুর ডানহাত ছিল।

বিস্মিত শুভেন বলল, তার খুনটা তোর কাছে কি খবরই নয় নাকি ? আমি তো ভাবছিলাম হাওড়া-বনধ ডেকে দিই আগামী কাল।

সরোজ তেমনি মৃদু হাসি-মাখা মুখে বলল, ডাকতে হবে না, এমনিতেই বনধ হয়ে যাবে। একটা খুন হলেই এলাকার দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

শুভেন গম্ভীর হয়ে বলল, বনধ ডাকতে চাইছি পাণ্টুর জন্য নয়। এইসব খুনখারাপীর বিরুদ্ধে আমাদের একটা কিছু করা উচিত। নাগরিক কমিটি, শান্তি কমিটি কেউ কিছু করছে না, পলিটিক্যাল পার্টি সবাই চুপ করে আছে। আর রোজ লাশ পড়ে যাচ্ছে।

সরোজ খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখল। কেনার পয়সা নেই বলে তাদের বাড়িতে খবরের কাগজ রাখা হয় না। সে রোজ সকালে এসে এই দোকানে কাগজ পড়ে। রাজনীতি, খেলা, সিনেমা সব পড়ে। আজও পড়েছে। নতুন কোনও জ্ঞানলাভ ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রায়ই হয় না।

শুভেন হঠাৎ বলল, স্বপন কোথায় বল তো।

স্বপন আজ আসেনি।

রোজই তো আসে বলে জানি।

সরোজ একটু যেন পাংশু মুখে বলল, হ্যাঁ। আজ আমার সঙ্গে একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। কিন্তু আসেনি।

ওর বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিস ?

না। ভাবছি যাবো।

শুভেনের বাস্তববুদ্ধি খুব খারাপ নয়। বাতাসে গন্ধ শুঁকে সে একটা কিছু টের পেল। হঠাৎ বলল, আসেনি যখন, তোরও আর গিয়ে কাজ নেই।

সরোজ অবাক হয়ে বলল, কেন বলুন তো ?

শুভেন চা শেষ করে আর এক কাপের অর্ডার দিয়ে বলল, যতদূর মনে হচ্ছে পাণ্টু মার্ডার হওয়ায় স্বপন গা-ঢাকা দিয়েছে। ওর বাড়ি নিশ্চয়ই ওয়াচ করছে কালুর ছেলেরা। তোর ওখানে না-যাওয়াই ভাল।

কিন্তু কালুর ছেলেরা বেলিলিয়াসে ঢুকবে কি করে ? বেলিলিয়াস তো স্বপন আর বাদলদার এলাকা।

দূর পাগলা। এলাকা আজকাল এবেলা ওবেলা হাতবদল হয়। কালুর দলে ভিখু নামে নতুন একটা ছেলে এসেছে। ডেঞ্জারাস টাইপ। স্বপনের বাড়ি তোর না যাওয়াই ভাল। আমার মনে হচ্ছে ওদের এলাকায় কালু পেনিট্রেট করেছে। পাণ্টু ওর মস্ত সহায় ছিল।

সরোজ একটু ম্লানমুখে বসে রইল।

শুভেন চা শেষ করে উঠতে উঠতে বলল, চ, আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

একটা মিটিংয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করি। কিছু একটা না করলেই নয়। এরা দিন দিন পেয়ে বসছে। রেলের ওয়াগন, কলকারখানা আর বেকারী যেখানে থাকবে সেখানে অ্যান্টিসোশালও তৈরি হবে। পার্মানেন্টলি এই সমস্যার সমাধান হবেও না। কিন্তু বাড়াবাড়িটা বন্ধ করতে হবে।

সরোজ ফ্যাকাসে মুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। দুর্বল গলায় বলল, কিন্তু শুভেনদা, স্বপনের যদি কিছু হয়ে থাকে ?

শুভেন সরোজের কাঁধে হাত রেখে মৃদু একটু আশ্বাসের চাপ দিয়ে বলল, স্বপনের খোঁজ আমি আর কাউকে পাঠিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু তুই খবদার যাস না। তুই যে স্বপনের বন্ধু তা ওরা জানে।

স্বপন তো আমার স্কুল-মেট। আমি তো আর বাদলদার দলে যাইনি।

তবু সকলে তো আর অতটা তলিয়ে বুঝবে না। আজকাল উঠতি ছোকরা

www.boiRboi.blogspot.com

মস্তানদের পকেটেও পিস্তল, রিভলবার, পাইপগান। ঘোড়া টিপবার জন্য আঙুল সবসময়ে নিসপিস করছে। তোকে দেখতে পেলে বেশি ভাবনাচিন্তা না করেই হয়তো নলটা তুলে ঘোড়া টিপে দিল।

সরোজের মুখখানা খুবই সাদা দেখাচ্ছিল। চোখে আতঙ্ক।

শুভেন ওর কাঁধে একটু চাপড় মেরে বলল, অত সাহসী বাপের ব্যাটা হয়ে তুই অত ভীতু কেন বল তো? আমি তো শুনেছি উমাদা স্বদেশী আমলে খুন খারাপীও করেছেন।

সরোজের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। শুকনো একটা ঢোঁক গিলে বলল, একটু আগে সকালের দিকে দুটো অচেনা ছেলে দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে একজন আমাকে লক্ষ্য করে কী যেন বলল পাশের ছেলেটাকে। তখন সন্দেহ হয়নি। এখন মনে হচ্ছে—

কী মনে হচ্ছে? তোকে মারতে এসেছিল? বলে খুব হাসল শুভেন। তারপর বলল, চ, তোকে বাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে যাই। ভীষণ ঘাবড়ে গেছিস।

ছেলে দুটোর মুখচোখের চেহারা ভাল নয়। অন্যরকম।

ও তোর মনের ভুল। আজকাল অধিকাংশ ছেলে ছোকরারই মুখচোখের চেহারা ভাল নয়। ডীপ ফ্রাস্ট্রেশন তো। এই যে তুই এত ভীতু ভালমানুষ গোছের ছেলে, তোকে দেখলে কি চট করে মনে হবে লোকের, যে তুই ভারী ভালমানুষ?

সরোজ আর কিছু বলল না।

বড় রাস্তায় পা দিয়েই সে অনুভব করল, আবহাওয়া ভাল নয়। এই কাজের দুপুরেও রাস্তা বেশ ফাঁকা। বাস রিক্সা টেম্পো বা লরি বিশেষ নেই। দোকানপাট বেশিরভাগই বন্ধ। থমথমে ভাব।

শুভেন চিন্তিত মুখে চারদিকটা লক্ষ্য করে বলল, নাঃ, এ তো দেখছি বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল।

কী শুভেনদা?

লোকে ভয় পাচ্ছে রে, বড্ড বেশি ভয় পাচ্ছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, গাড়িঘোড়া উইথড্রন হয়ে যাচ্ছে। ভেরি প্যাথেটিক। সমাজে এখন ঠিক দুটো ডায়ামেট্রিক্যালি অপোজিট শ্রেণী। একদল চূড়ান্ত ডরকোক, ভীতু। আর একদল মরীয়া, জান-কবুল। ইন বিটুইন প্রায় কেউই নেই। গড্ডলিকা প্রবাহ কাকে বলে জানিস? ভেড়ার পাল! ভেড়ার পাল সংখ্যায় যতই বাড়ুক একটা নেকড়ে তাড়া করলে সবকটা পালায়। এখনকার জনসাধারণ হচ্ছে হুবহু তাই, একজন রুস্তম একটা পটকা ছাড়লে বা একখানা পিস্তল আপসালে হাজারটা

লোক পড়ি কি মরি করে ছোটে।

জনগণের চরিত্র সম্পর্কে শুভেনের এই বাণী যতই সারগর্ভ হোক সরোজের তাতে বিশেষ পরিবর্তন হল না। সে ভীত সন্ত্রস্ত চোখে চারপাশটা দেখছিল।

বাঁ ধারে মোড়ের কাছে উমাপতিকে দেখা গেল। দুহাতে দুটো চটের বাজারব্যাগ নিয়ে আসছেন। ব্যাগদুটো ময়লা, তাপ্পিমারা, উমাপতির মুখে কয়েকদিনের না-কামানো দাড়ি, মুখে জবজবে ঘাম, চশমা ঘামে পিছলে নাকের ওপর অনেকটা নেমে এসেছে।

শুভেন ডাকল, উমাদা! কী ব্যাপার?

উমাপতি একবার মরা চোখে শুভেনের দিকে চাইলেন। এই বয়সে বোঝা টানার মতো শরীরের অবস্থা নয়। দাঁতে দাঁত চেপে, মনের জোরে চালু রাখেন মাত্র নিজেকে। একটু হাঁফধরা গলায় বললেন, রেশনের দোকানটা একটু হলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আর কি! কাল আবার খোলে কি না খোলে।

সরোজ বাবার দুরবস্থা দেখেও এগিয়ে গিয়ে বোঝাটা হাত থেকে নিল না। আসলে এসব সৌজন্যবোধ তার মাথায় খেলছেই না এখন। উমাপতি তার দিকে চেয়ে বললেন, এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? বাড়ি যা।

শুভেন বলল, বাড়িই যাচ্ছিল, পথে আপনার সঙ্গে দেখা। পাণ্টুর খবর পেয়েছেন নাকি?

না পাওয়ার কী? আমি তো তখন হাসপাতালেই ছিলাম, যখন বডি আনল। বিকেলে একটা মিটিং ডাকছি উমাদা, আসবেন? এ জিনিস তো চলতে দেওয়া যায় না।

আমি গিয়ে আর কী করব? আমি তো পাস্ট টেন্স। তোমরা যা করার কর। তবে মিটিং করে কি এসব বন্ধ করতে পারবে?

অন্তত লোককে একটু সচেতন করা যাবে। কিছু না করার চেয়ে তো সেটা ভাল হবে। এই সরোজ, উমাদার হাত থেকে ব্যাগদুটো নিয়ে বাড়ি যা।

সরোজ ব্যাগদুটো নিল। উমাপতি বললেন, আজ আর বেরোস টেরোস না।

সরোজ ঘাড় নেড়ে বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়ল।

একটু দূরে কোথাও একটা বোমার শব্দ হল। বেশ জোরালো শব্দ। উমাপতি বললেন, শুনলে তো! শুরু হয়ে গেল। মিটিং শেষ অবধি করতে পারবে কিনা দেখ। আর এরাও বুঝে গেছে যে, ভদ্রলোকেরা মিটিংয়ের বেশি আর কিছু করতে পারবে না। পুলিশ ওদের হাতে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওদের তেল দেয়, বড় বড় ইন্টডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ওদের পোষে। তোমার আমার মতো লোককে ওরা পরোয়া করবেই বা কেন?

www.boiRboi.blogspot.com

এই কথাটায় শুভেন একটু ক্ষুণ্ণ হল। উমাপতি তাকে সাধারণ মানুষ হিসেবেই গণ্য করছেন। শুভেন নিজে জানে, সে ততটা সাধারণ মানুষ নয়। অন্তত জনগণ বা জনতা বলতে যা বোঝায় তাদের দলের একজন সে নয়। সে কিছুটা নিশ্চয়ই বিশিষ্ট. আলাদা। উমাপতিও সেটা জানেন, স্বীকার করছেন না।

শুভেন বিনীতভাবেই বলল, আমরা না কিছু করলে আর কে করবে দাদা? জনসাধারণকে লিডারশিপ দেওয়ার মতো ক'জনই বা আছে?

উমাপতি অতিশয় বিরক্ত মুখ করে বললেন, সে তোমরা করো গে। ওর মধ্যে আমাকে ধোরো না। আমি পাস্ট টেন্স। আমার সময়কালে আমি যা করার করেছি। এদেশের লোক যে কী মাল দিয়ে তৈরি তা হাড়ে হাড়ে জানি। এখন তোমাদের যুবক বয়স, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারবে। আমার তেল ফুরিয়েছে।

বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর নয় উমাদা।

আলবাৎ ফ্যাক্টর। বয়স ফ্যাক্টর, সংসারের অবস্থা ফ্যাক্টর, ছেলেপুলেরা ফ্যাক্টর। সেসব বোঝবার মতো অবস্থা তোমার হয়নি। নিজে চাকরি করছো, বউমা করছেন, দোহাত্তা রোজগার। আর ওদিকে আমি দেশোদ্ধার করেছি আর আমার ছেলেপুলেরা বখে গেছে, সংসারের বারোটা বেজেছে। বুড়ো বয়সে বুড়ো আঙুল চুষছি। তোমাদের মতো চালাক তো আর ছিলাম না। বউয়ের গয়নাগুলো ইস্তক বাধা দিয়ে দেশোদ্ধার করেছি। এখন আর আমাকে মিটিং দেখিও না।

উমাপতি প্রায় চেঁচাচ্ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল, আজ সকালেও শরীরটা অস্পষ্ট নোটিস দিয়েছে। উত্তেজনা ভাল নয়। তাই হঠাৎ চুপ করে গেলেন। রুমাল নেই বলে, কোঁচা দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। বস্তুত শুভেনের কথায় তাঁর রেগে যাওয়ার কোনও কারণই ছিল না। মস্তানি বন্ধ করতে কেউ যদি মিটিং করতে চায় তো করতেই পারে। দোষটা কোথায়? আসলে বহুকালের নানা ক্ষোভ, ক্ষয়ক্ষতির স্মৃতি, ব্যর্থতা এসব জমে জমে ভিতরটা আজকাল সর্বদা তেতে থাকে।

শুভেনও জানে কোনও পরিস্থিতিতেই উত্তেজিত হতে নেই। এবং কোনও অপমানকেও গায়ে মাখতে নেই। উমাপতি স্বদেশী করতেন, দেশভাগের পরও রাজনীতি করেছেন। আজকাল আর কন্ধে পাচ্ছেন না। ফ্রাস্ট্রেশন তো থাকতেই পারে। দেশটা তো নানারকম ফ্রাস্ট্রেশনেই ভরে আছে। কিন্তু এই উমাপতির মতো লোককে শুভেনের দরকার। এইসব লোক শুভেনের পিছনে থাকলে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এইসব লোকের এমনিতে প্রভাব প্রতিপত্তি না থাকলেও

www.boiRboi.blogspot.com

একটা গুডউইল আছে। এরা মোটামুটি সৎ, নির্লোভ, স্বার্থত্যাগপরায়ণ, কষ্ট-পাওয়া লোক। এরা কারও পক্ষে হাত তুললে সেই হাত লোকের চোখে পড়বেই।

শুভেন ঘাড় চুলকে বলল, আজ বেলা হয়ে গেছে উমাদা, বাড়ি গিয়ে স্নান-খাওয়া করুন।

উমাপতি নরম হলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, শুভেন একসময়ে চন্দনাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছিল। অবশ্য নিতান্তই কাঁচা প্রস্তাব এবং মারফতি। উমাপতি রাজি হননি। ছোকরাকে তাঁর বিশেষ সুবিধের মনে হত না। আজও হয় না। তবে অনুচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া শুভেনের আর তেমন দোষও কিছু তাঁর নজরে পড়েনি। উমাপতি তার কাঁধে দুর্বল একখানা হাত রেখে বললেন, বুঝলে চারদিককার অবস্থা দেখে আজকাল আর মাথার ঠিক রাখতে পারি না। চট করে মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

তার কাঁধে রাখা উমাপতির হাতটা যে কাঁপছে, তা টের পেল শুভেন। কত বয়স হবে উমাপতির? আশিটাশি? কিন্তু এই বয়সেও মানুষটার রেহাই নেই।

॥ চার ॥

সরোজের যা কিছু প্রার্থনা সবই আকাশের কাছে। আকাশ তার কল্পতরু, আকাশ তার ঈশ্বর। ওই আলোহীন, শীতল, অনন্ত প্রসারিত শূন্য ও নিস্তব্ধতার মধ্যেই রয়েছে সৃষ্টির বীজ, মৃত্যুর আলঙ্ঘ্য নির্দেশ। একদিন সূর্য নিভবে, নিভে যাবে অনন্ত নক্ষত্রের আলো, ঘটবে কল্পান্ত। তবু এই অনন্ত প্রসারিত নিস্তব্ধতা শেষ হবে না। শূন্যের তো লয় নেই। সরোজ জানে এই জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা এই ব্যক্ত জীবনের যত উপচার আর আয়োজন। পায়ের নিচে মাটি, এও মিথ্যা। আসলে তার ওপরে আকাশ, নিচে আকাশ, চারদিকে আকাশ, আকাশ আর আকাশ। সে আর আকাশ। আকাশ আর সে। আর কে আছে না আছে তাতে কিছু এসে যায় না। জন্ম থেকে আমৃত্যু তার এই যে জীবন, এ শুধু নিজের সঙ্গে আকাশকে অঙ্গীভূত করে নেওয়া ছাড়া কিছু নয়। আকাশের সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টাই কি নয় মানবজীবন?

বরাবর, সেই বাল্যকাল থেকেই সরোজ হল হাঁ-করা ছেলে। একটু বোকা, একটু আনমনা, একটু কম বুঝদার। তার দুই দাদা অনেক বেশি বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, বিষয়ী। সে নয়। যারা প্রকৃত চিন্তাশীল তাদের কথা আলাদা। মহামস্তিষ্কসম্পন্ন চিন্তাশীলেরা নিত্যই পৃথিবীর ধ্যানধারণা পাল্টে দিচ্ছে, বিজ্ঞানে ঘটাচ্ছে অঘটন, অর্থনীতিতে আনছে বিপ্লব, সমাজনীতিতে

ঘটাচ্ছে ওলটপালট। সে ওরকম চিন্তাশীল নয়। তবে তার মাথাতেও আসে নানারকম চিন্তা, সেই শিশু বয়স থেকেই। আর সেইসব অদ্ভুত চিন্তার নানামুখী ধাক্কায় সে চিরকাল বেসামাল। রাস্তায় চলতে গিয়ে তার পা পড়ে খন্দে, পড়া ভুল করে, ভুল জামা ভুল জুতো পরে বসে থাকে। তবে সংসারটা বড় অভাবের, তাই একটু একটু করে মাথায় নানা বাস্তববুদ্ধি ঢুকতে থাকে। কিন্তু আজও সে প্রকৃত বাস্তববুদ্ধি থেকে অনেক দূরে। তাই বাড়ির লোক এখনও তাকে একটু সামলে চলে।

সরোজের চিন্তার রাজ্যটি কেমন তার হুবহু বিবরণ সে নিজেও দিতে পারবে না। সে এক আবোল তাবোল, উলট-পুরাণের রাজ্য। সেখানে কী ঘটে আর ঘটে না, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। তবে তার মাথা কখনও নিস্তব্ধ থাকে না, ঘুমে বা জাগরণে সেখানে সর্বদাই বুদ্বুদ উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। অফুরন্ত বুদ্বুদ। ক্ষণস্থায়ী, অর্থহীন। এইসব চিন্তার বুদ্বুদকে সে কখনও সাজিয়ে সিজিল-মিছিল করে নিয়ে দেখেনি। সে পারেও না তা। নিজের এলোমেলো মাথার ভিতর এইসব রঙিন বুদ্বুদ প্রত্যক্ষ করা—এই তার এ জীবনে সবচেয়ে বড় উপভোগ, সবচেয়ে বড় অবলম্বন।

কিন্তু আবার এক প্রগাঢ় অন্যমনস্কতা তাকে কেবলই এই চারদিককার নানা ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা, নানা অবশ্যকর্তব্য ও দায়দায়িত্ব থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়।

একটা কারখানায় সে সব্জী, ডিম আর পাঁউরুটি সাপ্লাই দেয়। কাজটা হয়ে যায় খুব সকালেই। তেমন জটিল বুদ্ধির কাজ কিছু নয়। বাঁধা ক্রেতা বাঁধা বিক্রেতা, সে শুধু মিডলম্যান। এছাড়া কয়েকটা টিউশনি করে সে। সবই বিকেল বা রাতে। সারাটা দিন ফাঁকা এবং খাঁ-খাঁ। এই সারাটা দিন নিয়েই যত জ্বালা। এই সময়টুকু যদি কোনও চাকরি বা কাজ দিয়ে ভরে নিতে পারত তবে বড় ভাল হত। কিন্তু হয়নি। বি-এস-সি পাস সার্টিফিকেটখানার জোরে বা টাইপিং আর শর্টহ্যাণ্ড দিয়ে কিছু কাজ আদায় করা শক্ত। তেমন চেষ্টাও সে করেনি। এই বাস্তববুদ্ধিহীন ছেলেটিকে কাছছাড়া করতে মা নারাজ। বুড়ো বয়েসে উমাপতিরও আর কোনও শক্তসমর্থ সহকারী নেই, সরোজ ছাড়া। কলকাতার আওতার বাইরে যেতে সরোজও খুব আগ্রহী নয়। হাওড়ার মধ্যে এঁদো গলির মধ্যে পঁচিশটি বছর কেটে গেল একটানা।

কথা ছিল স্বপন আজ একজনের কাছে নিয়ে যাবে চাকরির জন্য। ধরা-করা করে চাকরি পাওয়া ব্যাপারটা সরোজের একদম পছন্দ নয়। আত্মসম্মানে লাগে। সেটা স্বপনও জানে। তবে ভোলাবাবু নাকি ভাল লোক। চীনেবাজারে তাঁর

www.boiRboi.blogspot.com

একটা অফিস আছে। সারাদিন ভোলাবাবু চড়কিবাজি করে বেড়ান, অফিসে টেলিফোন আসে, পাওনাদার আসে, দেনাদার আসে। অফিস সামলাতে একজন চালাক-চৌকো লোক দরকার। বুদ্ধি করে টেলিফোনে গলা বুঝে মিষ্টি করে মিথ্যে কথা বলবে, পাওনাদার তাড়াবে আর দেনাদারকে বসিয়ে রাখবে। মাইনে তিনশ বা মেরেকেটে চারশ। সরোজ রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু স্বপন বলল, আরে সারাদিন বসে বসে ফাঁকা ঘরে আগড়ম বাগড়ম ভাববারও তো চান্স পাচ্ছিস। কলকাতায় দিনদুপুরে একখানা ফাঁকা ঘর পাওয়াই কি সোজা কথা?

স্বপন তাকে খুব ভাল চেনে। খুব শিশুকাল থেকে এক ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়েছে দুজন। সেই থেকেই তাদের গলায় গলায় ভাব। দুই বন্ধুর মধ্যে একটাই তফাৎ ছিল। স্বপনটা মারকুট্টা, ডানপিটে, চাঁড়ালে রাগী। সরোজ তা নয়। তবু দুজনেরই দুজনের প্রতি সাংঘাতিক টান ভালবাসা।

তা বলে যে দুই বন্ধুরই রাস্তা এক হবে তার কোনও মানে নেই। স্বপনের বাড়ির অবস্থা সরোজের চেয়েও খারাপ। চব্বিশ পরগণার সঈদপুর গ্রাম থেকে হাওড়ায় ভাগ্য ফেরাতে এসে ওর বাবা বিশেষ কিছু করতে পারেননি। নানা ধাক্কায় ঘুরে এবং মার খেয়ে অবশেষে একখানা তেলেভাজার দোকান দিয়েছিলেন। তাতে হয়তো চলেও যেত ওদের। কিন্তু দুটো পয়সা হাতে আসতে না আসতেই ছেলেছোকরারা তোলা আদায় শুরু করে দিল। প্রথম প্রথম চপ ফুলুরি পেঁয়াজী খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে যেত। তারপর শুরু হল পয়সা আদায়। দুর্বল এবং ভীতু মানুষটা এর কোনও প্রতিকার খুঁজে পাননি। সামান্য একটু খেঁকিয়ে ওঠায় ছেলেগুলো একদিন তাঁর উনুন উল্টে, কড়াই ফেলে, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। তাঁকেও দু-চার ঘা চড়চাপড় এবং লাথি খেতে হয়েছিল। ছেলেছোকরারা সব জায়গাতেই একটু ত্যাঁদোড় হয় বটে, কিন্তু এতটাই সাংঘাতিক রকমের হিংস্র হয় না। চারপাশটার মতিগতি বুঝে অগত্যা ফের তেলেভাজার দোকান চালু করলেন ঠিকই, কিন্তু যে-ব্যবসা রমরম করে চলার কথা ছিল তা টিমটিম করে চলতে লাগল। স্বপনের ছেলেবেলাটা যে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে তার সাক্ষী সরোজ নিজেই। আর ওই জন্যই দুঃখী বলেই স্বপনকে তার বড় আপন লেগেছিল।

স্কুল থেকেই স্বপনের গরম রক্তের ধাত প্রকাশ পেতে লাগল। কলেজে উঠে সে রীতিমত ষণ্ডা। পড়াশুনোর মাথা ছিল না কোনওদিনই। প্রায়ই বলত, এসব ফালতু পড়া পড়ে কী হবে? ঝুটমুট গলা শুকোনো। লাইনে নেমে পড়লে কাজের কাজ হয়।

সরোজ তাকে ফেরাতে পারত না, ফেরাতে পারেও নি। স্বপন যখন যা স্থির

করে তাই করে। এক চুলও সরে না। বাদলের দলে কী জটিল পথে গিয়ে সে ভিড়ল কে জানে। সেই থেকে দুই বন্ধুর রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। রইল শুধু ভাবটুকু। আজও আছে।

দু'খানা রেশনব্যাগ হাতে নিজেদের গলির মধ্যে ঢুকে সরোজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সরোজ জানে, স্বপন নিজেও জানে যে, স্বপন বেশিদিন বাঁচবে না। এ লাইনে এখানে খুব বেশিদিন কেউ বেঁচেবর্তে থাকে না। এখন পকেটে পকেটে পিস্তল, পাইপগান। কে কার পরোয়া করে ? দুদিন এক মস্তান মাথা চাড়া দেয় তো একদিন তার লাশ পড়ে থাকে নর্দমার ধারে। আর একজন তার জায়গা নেয়। কিন্তু বেশিদিন কেউ শিখরে থাকতে পারে না। খুনখারাপী, মস্তানি বা লাইনের গল্প কখনও স্বপন করত না তার সঙ্গে। কিন্তু ওর মুখ দেখে মাঝে মাঝেই সরোজ বুঝে যেত, স্বপন ক্রমশ খুব বিপদ আর টেনশনে জড়িয়ে পড়ছে। তবে সংসারের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে স্বপন। যে-বাড়িটায় ভাড়া থাকত সেটাই বাড়িওলার কাছ থেকে কিনে নিয়ে খোলার ঘর ভেঙে পাকা দালান তুলে ফেলে। সোফাসেট, খাওয়ার টেবিল, একখানা সাদা-কালো টিভি অবধি গড়িয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে পটাপটি হল। বিয়েটা হবো-হবো করছে। সন্ধ্যা সরোজদের গলিতেই থাকে। দুটো বাড়ি আগে। কিন্তু এত সুখের আয়োজনের আড়ালে বিস্ফোরক তো তৈরি হয়েই ছিল।

স্বপন কি পালিয়েছে ? খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। স্বপন তো পালানোর ছেলেই নয়। তবু যদি কেলোর দল ওর পাড়ায় পেনিট্রেট করেই থাকে আর ও যদি পালিয়ে যেতে পেরে থাকে তো খুব ভাল। কিন্তু সরোজের ভয়, স্বপন পালায়নি। খুব একটা গণ্ডগোলে পড়েছে। নইলে কথা যখন দিয়েছিল, ঠিক আসত।

যে-দুটি ছেলে তাকে ওয়াচ করে গেল তাদের কথা ভেবে একটু শিউরে উঠল সরোজ। ব্যাগদুটো তুলে বাড়ির দিকে এগোলো।

দরজা খুলে শ্রীময়ী উদ্বেগের গলায় বলল, এই এলে ? কী সব গণ্ডগোল হচ্ছে শুনছি, দেরি দেখে যা ভয় পাচ্ছিলাম। বাবা কোথায় ?

আসছে।

শ্রীময়ী স্নান করেছে। এলোচুলে চকচকে করে তেল মেখেছে। ডগডগে সিঁদুর দিয়েছে সিঁথিতে। কপালে সিঁদুরের টিপ, তা থেকে সিঁদুরের গুঁড়ো পড়েছে নাকের ডগায়। তার বয়স পঁচিশ-টঁচিশের বেশি নয়। খুব সুন্দরী ছিল না কখনও, তবে কুৎসিৎও নয় মোটেই। স্বামী নেয় না বলে অবশ্যই দুঃখ আছে

www.boiRboi.blogspot.com

তার, কিন্তু সারাদিন দুঃখী-দুঃখী ভাব করে সে থাকে না। স্বামী নেই বটে, কিন্তু এই তার আত্মীয় পরিজনের মধ্যে শ্রীময়ী নিজেকে জড়িয়ে নিতে পেরেছে।

সরোজ ঘরে ঢুকতেই শ্রীময়ী পাখা খুলে দিল, লুঙ্গি এগিয়ে দিল, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে রাখল টেবিলে। শ্রীময়ীর চলাফেরা এবং কাজকর্মের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ আন্তরিকতা আছে। বউদি ছাড়া সরোজ অন্ধকার দেখে চারধার। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে একরকম বউদির আঁচল-ধরা।

শ্রীময়ী রেশন রাখতে ভিতরে গিয়েছিল। চট করে ফিরে এসে বলল, মুখখানা ওরকম তোম্বা করে আছো কেন ? কী হয়েছে ?

জলের গেলাসটা বউদির হাতে দিয়ে সরোজ কাঠো-কাঠো গলায় বলল, স্বপনটার যে কী হল বুঝতে পারছি না। এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল ওর সঙ্গে। সহজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করে না তো। ওদিকে ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে শুনছি। কালুর দল নাকি ওদের পাড়ায় ঢুকে পড়েছে।

শ্রীময়ী একটু সাদা হয়ে গেল হয়তো। কিন্তু শান্ত গলাতেই বলল, যাও, স্নান করে নাও ভাল করে। খেয়েদেয়ে একটু জিরোও। অত ঘাবড়াবার কিছু নেই।

সরোজ কাহিল গলায় বলল, স্বপনকে যদি মেরে ফেলে বউদি ?

শ্রীময়ী সরোজের মাথার ঝুঁটি ধরে একটু নেড়ে দিয়ে হাসল। তারপর হাত ধরে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, অতই যদি ভয় তবে বন্ধুকে গুণ্ডামী করতে দাও কেন ? অত ভয় পেও না। স্বপন ভীষণ চালাক ছেলে। তোমার মতো বোকা নয়।

ভিতরের ঘরে দুই নাতিকে মেঝেয় বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন কমলাবালা। এই দুই শিশু ঠাকুমা ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকেই আপনজন বলে ভাবে না। নাতিদের খাওয়াতে খাওয়াতে কমলাবালা একবার চোখ তুলে ছেলের দিকে তাকালেন।

ঘরে ঢুকবার আগেই শ্রীময়ী সরোজের হাত ছেড়ে দিয়েছিল। দেওরের সঙ্গে তার একটু নির্দোষ মাখামাখি আছে। সেটা কমলাবালা পছন্দ করেন কিনা কে জানে। তবে তিনি একবার ঘী আর আগুনের উপমাটা আলতো ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। সেই থেকে শ্রীময়ী সাবধান হয়েছে।

বাথরুমের দোরগোড়ায় এসে শ্রীময়ী বলল, এই কার্তিকে টনকো জলে স্নান করলে টক করে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। গায়ে একটু তেল মেখে নাও।

সরোজ নাক সিঁটকে বলল, ও বাবা, আমি ওই রেপসিড গায়ে মাখতে পারব না। ঘেন্না করে।

শ্রীময়ী হেসে মাথা নেড়ে বলল, রেপসিড নয়। একটু সর্ষের তেল আছে আমার কাছে। এনে দিচ্ছি।

রান্নাঘর থেকে একটা ছোট্ট শিশি এনে দিল শ্রীময়ী। তারপর চাপা গলায় বলল, এত যত্ন বউও করবে না, বুঝলে!

সরোজ একটু জেদী গলায় বলল, বউয়ের দরকার নেই।

মুখ টিপে হেসে শ্রীময়ী বলল, শুধু বউদি হলেই চলবে? তাই কি হয় ভাই! বেড়াল দিয়ে হালচাষ!

বেশি বোকো না। মেয়েরা যে কেন এত বকাবাজ হয়।

কমলাবালা নাতিদের জন্য আরও দুটি ভাত চাইলেন উঁচু গলায়, অ বউমা, দুটি ভাত দাও। আলুভাজা থাকলে দিও। মুখের খুব তার হয়েছে বিচ্ছুগুলোর।

যাই। বলে শ্রীময়ী ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। শাশুড়িকে সে ভীষণ ভয় খায়।

স্নান করার সময় আজ একটু শীত করল সরোজের। আবহাওয়াজনিত না ভয়জনিত তা খুব ভাল বুঝল না সে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে একটু রোদে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল তার। এ বাড়িতে রোদ অতি দুর্লভ। একমাত্র সদর দরজা খুলে বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়ালে একটু রোদ পাওয়া যায়। আজ সদরে গিয়ে রোদে দাঁড়াতে সরোজের ইচ্ছে করল না।

উমাপতি ফিরে এসেছেন। বাইরের ঘরে শ্রীময়ীকে উত্তেজিত কণ্ঠে কিছু বোঝাচ্ছেন। বোধহয় দেশকাল পরিস্থিতির কথা, দেশের ক্রমাবনতির কথা এবং নিজেদের উজ্জ্বল যৌবন ও আত্মত্যাগের কথাও। উমাপতি আজকাল কদাচিৎ মুখ খোলেন। স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের কাছে কখনোই নয়। তারা বহুবার শুনে শুনে বিরক্ত। স্ত্রী কমলাবালা তো স্বামীর অতীতের নামে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। ছেলেরাও উপেক্ষা করে। তবে শ্রীময়ী কখনও ধৈর্য হারায় না, খ্যাঁক করে ওঠে না বা কথার মাঝখানে স্থানত্যাগ করে না, বরং খুব মন দিয়ে সমবেদনার সঙ্গে শ্বশুরের সব কথা শোনে বলে উমাপতি একমাত্র শ্রীময়ীর কাছেই মুখ খোলেন।

পিছনের দরজা খুলে নাতিদের মুখ ধুইয়ে ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলেন কমলাবালা। ছেলের দিকে একটু কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, হাবুর বাবা টাকা দিয়েছে? দেবে।

হাবুকে পড়াত সরোজ। সম্প্রতি তার বাবা লে-অফের পাল্লায় পড়ে ঘরে বসে আছে। সরোজ আর পড়ায় না। দু' মাসের টাকা বাকি। কমলাবালা সেকথা ভুলতে পারেন না। রোজ একবার করে জিজ্ঞেস করবেনই। কার চাকরি গেছে কি না গেছে তা তিনি বুঝতে চান না। তাঁর প্রশ্ন টাকা নিয়ে। ইদানীং পাওনাগণ্ডার ব্যাপারে বড্ড বেশী কঠোর হয়েছেন।

কমলাবালা আঁচল দিয়ে নাতিদের মুখ সযত্নে মোছাতে মোছাতে বললেন,

আর দেবে। দেওয়ার মানুষ হলে দু-পাঁচটাকা করে দিয়ে ফেলত।

লোকটার চাকরি নেই, খাবার জুটছে না, একটু কনসিডার করবে তো!

আমাদের কে ছেড়ে দিচ্ছে রে? দিতে পারব না বললে আমাদের পাওনাদাররা ছাড়বে? গলায় গামছা দিয়ে আদায় করবে না?

সরোজ একটু রেগেই গুম হয়ে ঘরে ঢুকছিল। কমলাবালা কঠিন গলায় বললেন, তোর বাবাকে বক্তৃতা বন্ধ করে স্নানে যেতে বল। বেলা হয়েছে। চন্দনার খাবার কি পাঠান হয়েছে? বউমাকে জিজ্ঞেস কর তো। কারও বোধহয় খেয়ালই নেই। পোয়াতি মেয়েটা খিদেয় কাতরাচ্ছে।

উমাপতির আজকাল অনেক কিছুই খেয়াল থাকে না বটে। কিন্তু শ্রীময়ী সেরকম নয়। ননদের ভাত টিফিন ক্যারিয়ারে সে সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু রেশন দোকান থেকে তেতেপুড়ে আসা শ্বশুরকে তক্ষুনি আবার হাসপাতালে পাঠাতে তার কষ্ট হচ্ছিল। একটু দম ছাড়ার ফুরসৎ দিচ্ছিল বুড়ো মানুষটিকে। উমাপতির মুখচোখের চেহারা সে ভাল দেখছে না। গাল দুটো হঠাৎ একটু বসে গেছে, চোখের দৃষ্টিও বেশ ঘোলাটে।

সরোজ যখন চুল আঁচড়াচ্ছিল তখন শ্রীময়ী এসে বলল, তুমি তো যাবে না হাসপাতালে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বাবার শরীরটা আজ ভাল নেই।

বাবার কী হয়েছে?

তা কী করে বলব? উনি তো কিছু বলেন না। ভাবছিলাম খাবারটা যদি এবেলা আমিই পৌঁছে দিয়ে আসি। এবেলাই শেষ। চন্দনার বর আজই নাকি ওকে নিয়ে যাবে।

সরোজ চিরুনি রেখে বলল, বাঁচা গেল। বড়লোকের বউ নিয়ে মহা ঝামেলা ছিল বাবা।

চন্দনা শুধু বড়লোকের বউই নয়, এ-বাড়ির মেয়েও। কিন্তু বিয়ের পর থেকে চন্দনা কেমন উন্নাসিক, ন্যাকা আর বড়লোক-বড়লোক ভাবাপন্ন হয়ে গেল। এ-বাড়িতে যে দু-একবার এসেছে বেশ একটু দেমাক প্রকাশ করতে ছাড়েনি। এই অতীতটাকে বোধহয় ভুলতে চাইছে চন্দনা। যদি ভোলে তাতে বিশেষ আপত্তি নেই সরোজের। ও ভুলুক, সরোজরাও ভুলবে। ভুলতে পারছে না শুধু কমলাবালা। খানিকটা আত্মমর্যাদা এবং খানিকটা উমাপতিকে শিক্ষা দেওয়ার দ্বৈত উদ্দেশ্যেই বোধহয় জামাইয়ের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও মেয়ের ডেলিভারির দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলেন তিনি। এতে কোনও পক্ষই খুশি হয়নি। চন্দনা এবং হিমাংশু দুজনেই চেয়েছিল নার্সিং হোমের সুব্যবস্থা এবং আরাম। উমাপতির কোমরে সেই জোর নেই। ফলে হাসপাতালের কেবিন নেওয়া হল।

www.boiRboi.blogspot.com

তাতে চন্দনা বা হিমাংশু খুশি হল না। উল্টে উমাপতির খাটুনি বাড়ল তিনগুণ। সংসারে এল খানিকটা বাড়তি চাপ এবং বড়লোকের বউকে যথেষ্ট খুশি করতে না পারার গ্লানি।

এসবের জন্য কমলাবালাই দায়ী। তবে তাঁর সঙ্গে ও নিয়ে কথা বলেনি সরোজ। মা রেগে যাবে। আজলে কমলাবালা বোধহয় একটা জীবন যে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করেছেন তার একটা শোধ তুলতে চান সংসারের সকলের ওপর। তাই ইদানীং তিনি বেশ কঠিন এবং নির্মম।

উমাপতি বাইরের ঘরে বসেই পাখার হাওয়া লাগাচ্ছিলেন গায়ে, এসময়ে শ্রীময়ী টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে এসে চটি খুঁজছিল চৌকির তলায়।

উমাপতি আঁতকে উঠে বললেন, তুমি কোথায় চললে ?

এবেলাটা আপনি একটু জিরোন বাবা, আমি খাবারটা দিয়ে আসি। চন্দনার সঙ্গে দেখাটাও হয়ে যাবে, আজই তো চলে যাচ্ছে।

পাগল নাকি ? বড় মস্তান খুন হয়েছে কখন হাঙ্গামা লেগে পড়ে তার ঠিক নেই, এই পরিস্থিতিতে ঘরের বউরা বেরোয় নাকি ? দাও দাও, আমাকে দাও।

আপনি সকাল থেকে একটুও বিশ্রাম পাননি। শরীরটা কাহিল দেখাচ্ছে।

উমাপতি ক্লিষ্ট একটু হাসলেন। বললেন, ওরে বোকা মেয়ে, আমি কি আর শরীরে ভর করে চলি ? আমি চলি মনের জোরে। শরীর-শরীর করলে কবে শ্মশানে পৌঁছে যেতাম ! দাও, ওটা আমিই দিয়ে আসি।

আর, আপনার বুঝি ভয় নেই বাবা ? হাঙ্গামা হলে কি আপনার বিপদ ঘটবে না ?

যদি কিছু হয় তো ভগবানের আশীর্বাদই বলেই ধরে নিও। বুড়ো জঞ্জাল যত সাফ হয় ততই ভাল। তাছাড়া খুনখারাপী আমিও করেছি। এখন খুন হলে সেটা কর্মফলই ফলবে। দাও, দিয়ে আসি। আর তোমরা বসে না থেকে, খেয়ে নিও।

হাত বাড়িয়ে উমাপতি টিফিন ক্যারিয়ারটা নিলেন। শ্রীময়ী ছাতাটাও এগিয়ে দিয়ে বলল, বড্ড রোদ উঠেছে। এটা নিয়ে যান।

দুহাতে দুটো ? তা দাও, চতুর্ভুজ হতে আর বাকি কী।

বেরোনোর সময় দরজার মুখ থেকে ফিরে উমাপতি বললেন, আর একটা কথা বউমা, সরোজকে আজ আর বেরোতে দিও না। অবস্থাগতিক ভাল নয়।

শ্রীময়ী মিষ্টি হেসে বলল, না দেবো না বেরোতে। আপনি ফিরে আসুন, তারপর আজ রাত অবধি আমরা তিনজনে তাস খেলব। দুরি ফিস।

উমাপতি একগাল হাসলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। শ্রীময়ী উঁকি দিয়ে

উমাপতির গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো। বড় রাস্তা অবধি একদম জনমনিষ্যি নেই কোথাও। খাঁ খাঁ করছে দুপুর। উমাপতি ঠিকঠাকমতো হাসপাতালে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে পারবেন কিনা সেটা চিন্তার বিষয়। শ্রীময়ী গেলেই ভাল হত।

উমাপতি বড় রাস্তায় পৌঁছে অদৃশ্য হতেই শ্রীময়ী দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

ভিতরের দিককার দরজায় সরোজ দাঁড়িয়ে। মুখে একটা জলে-পড়া ভাব। স্তিমিত গলায় বলল, বাবাই গেল, না বউদি ?

শ্রীময়ী মৃদু হেসে বলল, তুমি কি ভেবেছিলে যে উনি এই হাঙ্গামায় আমাকে যেতে দেবেন ? সেরকম মানুষ তো উনি নন। মরে গেলেও মেয়েদের বিপদের ঝুঁকি নিতে দেবেন না। বুঝলে মিয়া, সে আমলেই যা কিছু পুরুষমানুষ জন্মেছিল, তোমাদের আমলে সব ভেড়া। দল বেঁধে বোমা বন্দুক নিয়ে মানুষ মারাটাই শুধু বীরত্ব, আর এসব বীরত্ব কিছু নয় বুঝি ? আশির ওপর বয়স, শরীরে হাড় ক'খানা সার, সকাল থেকে পেটে দানাপানি নেই, তবু এই হাঙ্গামার মধ্যে বেরিয়ে গেলেন, কেন না বউমার বিপদ হবে। দিস ইজ হিরোইজম, বুঝলে ?

সরোজ মৃদু একটু হাসল। তারপর বলল, মা যদি শুনতে পায় তাহলে তোমার হিরোওয়ারশিপ বের করে দেবে বুঝলে !

জানি। তবু বলি, তোমরা লোকটাকে একটুও চিনলে না।

খুব চিনি। লোকটা হচ্ছে বুরবক অফ দি ফার্স্ট ওয়াটার। ফ্রিডম ফাইটার্স পেনশনটা পর্যন্ত নেয়নি, তাম্রপত্র রিফিউজ করেছে। মুচমুচ করছে অহংকার, অথচ মুরোদ নেই।

ওকথা বোলো না, বোলো না, প্লীজ, তোমার পাপ হবে।

কথাটা আমার নয়, বউদি, মায়ের।

জানি। তবু তুমি উচ্চারণ কোরো না। তোমার পাপ হবে। লোকটার জন্য তার দেশ কিছু করেনি সে-ও সওয়া যায়, তার পরিবার তাকে অনাদর করে তা-ও সওয়া যায়, কিন্তু ছেলে তাকে ঠাট্টা করে এটা কিন্তু সওয়া যায় না।

সরোজ শ্রীময়ীকে চেনে। জীবনের একটা মস্ত দুঃখ আর লজ্জাকে সবসময়ে বুকে চেপে রাখতে হয় বলে শ্রীময়ীর ভাবপ্রবণতা নানা উপলক্ষে 'যেটে' বেরোয়। মনোজ কাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে তা এবাড়ির কেউই জানে না। সেই অচেনা অজানা একটা মেয়ের কাছে হেরে গিয়ে শ্রীময়ী যে কিভাবে এখনও নিজেকে সেই মনোজেরই আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে, কত ঘেন্নায় লজ্জায়, সেটা সরোজ অহরহ টের পায়। এই দুঃসহ অপমান সে সহ্য করে

www.boiRboi.blogspot.com

উমাপতি আর সরোজের মুখ চেয়ে। উমাপতি তাকে প্রাণাধিক ভালবাসেন।

॥ পাঁচ ॥

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যে রাস্তার সব যানবাহন বন্ধ হয়ে যাবে তা বড় রাস্তায় পা দিয়েই বুঝে গেলেন উমাপতি। একটু দূরে কোনও গলির মধ্যে ধমাধম বোমা পড়ছে। খুব রাগী শব্দ। নোংরা শব্দ। উমাপতির ধারণা, ক্ষুদিরাম যে-বোমা মেরেছিল তার শব্দ আর কালু ওস্তাদের চেলাদের বোমার শব্দ একরকম হতেই পারে না।

উমাপতি বাস স্টপে দাঁড়িয়ে বারুদের কটু গন্ধ পেলেন। তিনি ছাড়া রাস্তায় বড় একটা কেউ নেই। বাস আসবে কি ? না কি হেঁটে রওনা হয়ে পড়বেন ? হাসপাতাল খুব বেশি দূর নয় বটে, কিন্তু উমাপতির হাঁটুদুটো বারবার ভেঙে আসতে চাইছে। সামান্য টিফিন ক্যারিয়ারের ভার বহন করতে ভেঙে আসছে কাঁধ। ছাতাটায় একটু ভর রেখে দাঁড়ালেন। একটু দাঁড়িয়ে যাওয়াই ভাল। যদি একটা ছুটকোছাটকা বাস চলেই আসে !

সামনে একটা গলির মুখ দিয়ে দুটো ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে আর একটা গলিতে সেঁধিয়ে গেল। উমাপতি কেৎরে দাঁড়িয়ে দেখলেন। এসব বাইরের ঘটনা তাঁকে আজকাল তেমন বিচলিত করে না। গুণ্ডা এবং বীর এই দুইয়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। বীরত্বের মধ্যে স্বার্থত্যাগ আছে বিশ্বাসের জোর আছে, নির্ভরতা আছে। গুণ্ডারা লোভী, লোভের দরুণই বে-পরোয়া। তাদের সঙ্গে দেশের মূল জীবনস্রোতের কোনও যোগাযোগ নেই। তাই গুণ্ডা মস্তানদের তিনি ততটা ভয় খান না, এড়িয়ে চলেন মাত্র। তবে তিনি জানেন, হাল আমলের রাজনীতিতে গুণ্ডা মস্তানদের অনেকটা ভূমিকা আছে। যা স্বদেশী আমলে ছিল না। এখনকার নেতারা মস্তানদের হাতে রাখেন, তখনকার নেতারা রাখতেন না।

উমাপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতবদল করলেন। রোদটা ঘাড় গরম করে ছিল বলে ছাতাটাকে খুলতে হল। তারপর একা দাঁড়িয়ে রইলেন। বোমা পড়ছে তো পড়ছেই। একটার পর একটা। খুব দূরে নয়। আবার খুব কাছেও নয়।

আশ্চর্য এই যে, একটা বাস এল। ঝড়ের গতিতে আসছিল, বোধহয় এক্ষুনি গিয়ে গ্যারাজে ঢুকে যাবে। উমাপতি টিফিন-ক্যারিয়ার শুদ্ধ হাত তুললেন।

বাস দাঁড়িয়ে গেল।

উঠুন দাদু, তাড়াতাড়ি উঠুন। লাস্ট বাস।

উমাপতি উঠলেন। ফিরতি পথে হাঁটতে হবে বুঝতেই পারছেন। কণ্ডাক্টর জোরে ঘণ্টি বাজিয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে চেঁচাল, টেনে যাবি।

বাসে লোক নেই বললেই হয়। সাকুল্যে জনা দশবারো। সকলেই একটু উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে। কারও মুখে কথা নেই। তাদের মধ্যে একমাত্র উমাপতিই নিরুদ্বেগ মুখে বসে রইলেন।

হাসপাতালের ভীড়টা আরও বেড়েছে। তবে তেমন হৈ-চৈ নেই। কেমন বুকচাপা দমবন্ধ ভাব। মেলা পুলিশও রয়েছে চারদিকে। একটা ঘোঁট যে পাকিয়ে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই। উমাপতি ভীড় এড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

চন্দনাকে বেশ সাজিয়েছে আজ আয়া। চুলে তেল, মুখে পাউডার, একটু কি লিপস্টিকও, আজকাল আঁতুর না যেতেই এসব হয় বুঝি ?

উমাপতি টিফিন ক্যারিয়ার রেখে বললেন, একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নে মা। আজ আবার হাঙ্গামা বেঁধেছে। ফিরতে বাস পাবো না।

কী হয়েছে বাবা ?

ওই যা হয় আর কি। গুণ্ডায় গুণ্ডায় লড়াই। তোকে আজ হিমাংশু ঠিক নিতে আসবে তো !

চন্দনা একটু মিষ্টি হাসি হেসে বলল, ঠিক আসবে। বেলা এগারোটা নাগাদ ওর এক বন্ধু এসে আরও পাকা খবর দিয়ে গেল। দুটো আড়াইটের মধ্যেই চলে আসবে।

একদিক দিয়ে ভালই হল। রাতে হয়তো খাবারটা দিয়ে যেতে পারতাম না। বাস বন্ধ, বোমাও চলবে।

আচ্ছা বাবা, এ কাজটা তো সরোজও করতে পারত। বউদিও তো আর কচি খুকিটি নয়। তুমি বুড়ো মানুষ, তিন বেলা তোমাকেই বা কেন হাসপাতালে আসতে হয়।

উমাপতি এ নিয়ে প্রশ্নের জবাব অনেকবার দিয়েছেন। সরোজের ভয়, বউমা মেয়েছেলে, কিন্তু সেসব জবাবে চন্দনা খুশি হয় না। নানা কটুকাটব্য করে। তাই চুপ করে রইলেন।

চন্দনা আয়াকে বলল, প্লেটে আর বাটিতে খাবারটা ঢেলে রেখে টিফিন ক্যারিয়ারটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে দাও।

উমাপতি রুমালের অভাবে ছাতাটা দিয়েই কপালের ঘাম মুছলেন।

চন্দনা বলল, শোনো বাবা, এ যাত্রায় আর তাহলে মা'র সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।

উমাপতি আঁতকে উঠে বললেন, না, না, যা অবস্থা ও পাড়ায় আজ না

www.boiRboi.blogspot.com

যাওয়াই ভাল।

দুর্গাপুরে গিয়ে চিঠি দেবো। চিন্তা কোরো না, ওখানে তো ভালই থাকি। আর সরোজকে বোলো একবার যেন দুর্গাপুর যায়। ওর জামাইবাবুর খুব ইনফ্লুয়েন্স, ঠিক চাকরি দিয়ে দেবে।

উমাপতি সেটা জানেন। তবে সরোজকে কাছছাড়া করার ব্যাপারে খানিকটা অসুবিধে এখনও আছে। নিজের শরীরের অবস্থা উমাপতি ভাল বুঝছেন না। যতদিন খাড়া আছেন মনের জোরে সংসার চালিয়ে নেবেন, বাজারহাটও আটকে থাকবে না। কিন্তু একদিন মনের ওপর শরীর চেপে বসবেই। তখন সংসারে সমর্থ পুরুষ সরোজ ছাড়া আর কে?

চন্দনা বাপের মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, তোমাদের ওই একটা দোষ। ছেলেকে আগলে বসে থাকবে। তারও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। তাছাড়া ওই মেনীমুখো ছেলেটা বাইরে না গেলে মানুষ হবে ভেবেছো?

উমাপতি জীবনে অনেক উপদেশ শুনেছেন, আজও শুনলেন। বিশেষ প্রতিক্রিয়া হল না। চন্দনা তো তাঁদের ভালই চাইছে। কিন্তু সেই ভাল কতদূর ভাল তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। জামাইয়ের অনুগ্রহ নিতেও তাঁর একটু আপত্তি আছে। কিন্তু সেকথা তিনি মুখে কখনও বলেন না। আবার ছেলেকে আটকে রাখলে স্বার্থপরতা হয়। দোটানা।

মুখে বললেন, তোর গর্ভধারিণীই এখন সংসারের ভালমন্দের কর্ত্রী। আমার মতামতের কোনও দাম নেই। ঠিক আছে, বলে দেখব তাঁকে।

তোমার জামাই নিজেই তো আমাকে বলেছে, সরোজ যদি দুর্গাপুরে আসতে রাজি হয় তো আটশো টাকা মাইনের চাকরি বাঁধা। ইচ্ছে করলে কন্ট্রাক্টরিও করতে পারে। অডরি তো তোমার জামাইয়েরই হাতে। তাতে রোজগার আরও বেশি।

আয়া টিফিন ক্যারিয়ারটা ধুয়ে এনে দিল। উমাপতি উঠলেন। নাতির ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার তাকালেন। আলাদা বেবী কটে নীল মশারির মধ্যে ঘুমোচ্ছে। শিশু, দুনিয়ার হালচাল এখনও জানে না। উমাপতি একটু মায়াবোধ করলেন। সামান্যই। বুকটা একটু দুলে উঠল মাত্র।

চলি রে।

চন্দনা উঠে প্রণাম করল। উমাপতি টেবিলে প্লেটের ওপর সাজানো খাবারটা আড়চোখে দেখে নিলেন। দু টুকরো মাছ, লাবড়ার তরকারি, ডাল, পোস্ত আর ফুলকপির ডালনা। মন্দ নয়। আয়োজন ভালই। তবু চন্দনা এতে খুশি হবে কিনা কে জানে। তবে ছোটো ভাঁড়ের এক ভাঁড় ভাল দৈ আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

উমাপতি বেরিয়ে পড়ার আগে আয়ার টাকাটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিয়ে কয়েকটা নোট বের করলেন।

চন্দনা বলল, শোনো বাবা, ও টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না। আমি দিয়ে দেবোখন।

তুই দিবি কেন?

থাক না। এই একবারই দিচ্ছি। আর বখশিশও তোমাকে দিতে হবে না। ওরা তো ওদের জামাইবাবুর কাছ থেকে আদায় করবেই।

একটু দোনোমোনো করে উমাপতি নিরস্ত হলেন। দিলে দিক। দশটা টাকা তো বাঁচল। তবে কথাটা কমলাবালার কানে উঠলে কুরুক্ষেত্র করবেন নির্ঘাৎ।

বাবার মনের কথা বুঝে নিয়েই যেন চন্দনা বলল, মাকে কিছু বলতে হবে না। সংসারের অবস্থা তো আমি জানি, তুমি ভেবো না।

মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকালেন উমাপতি। বড় আদরের মেয়ে। বরাবর উমাপতির বড় ন্যাওটা ছিল। সারাদিন কোলে আগলে রাখতেন। বিয়ের পর মেয়েটা যে সুখী হয়েছে এটাই বড় ভরসা। যদি একটু পর-পর ভাব হয়েই থাকে তবে সেটাও ভালই। মেয়েরা বিয়ের পর বাপের বাড়ির সঙ্গে যত কাটান ছাড়ান করতে পারে ততই সুখী হয়। বাপের বাড়ির টান বেশি থাকলে স্বামীর ঘর কেন যেন আপন হতে চায় না।

অল্পবয়সী আয়াটি বাইরে কোথাও গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, আজ বিকেলে পাণ্টুদার ডেডবডি নিয়ে মিছিল বেরোবে। বাইরে খুব শ্লোগান হচ্ছে।

শ্লোগান শুনতে পাচ্ছিলেন উমাপতি। এতক্ষণ ছিল না। বললেন, মিছিল কারা বের করবে জানো? পাণ্টু তো কোনও দলের ছিল না যতদূর জানি।

আয়া একটু হাসল। বলল, সে তো সবাই জানে। কালুর দলে ঢুকে গুণ্ডামী করত। কিন্তু শুভেনবাবু বলছেন পাণ্টুদা নাকি ওঁর দলের ছেলে।

শুভেন? বলো কী!

গেট-এর কাছে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে শুভেনদা লোকদের ঠাণ্ডা হতে বলছেন। মাইক এলেই গরম গরম বক্তৃতা দেবেন।

উমাপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শুভেনটা পুরোপুরি ছাগল। আর মানুষ হবে না। কোন ঘটনাকে কিভাবে রাজনৈতিক সুবিধের জন্য কাজে লাগানো যায় এই ধান্দায় ছোকরা পাগলা হয়ে গেল। তবে ওর তেমন দোষ আর কি? এরকম ধান্দা সবাই করছে।

চন্দনা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, বাবা, এই গোলমালে তুমি যাবে কি করে?

উমাপতি হেসে বললেন, এটা কোনও গোলমাল নয়। মিছিলও ভাল,

শ্লোগান বা বক্তৃতাও ভাল। ভয় অন্য জিনিসকে। কালু বদলা নিতে শুরু করেছে।

তুমি তাহলে তাড়াতাড়ি চলে যাও।

যাই। হাসপাতালের পেমেন্টও মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

উমাপতি বেরিয়ে পড়লেন। হাসপাতালের বিল মেটাতে কিছুটা সময় গেল। যখন বেরোচ্ছেন তখন দেখলেন, বাস্তবিকই শুভেন ফটকের বাইরে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে মাইক হাতে নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। বেশ গরম বক্তৃতা। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। শহীদ পাণ্ডুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হাওড়া বন্ধ করা হোক। পাণ্ডুর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতেই হবে। পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও জনমত তৈরি করতে হবে। ইত্যাদি।

ফটক জ্যাম হয়ে আছে লোকের চাপে। ঠেলেঠুলে তার মধ্যে দিয়েই বেরোলেন উমাপতি। আর দেরী করা ঠিক নয়।

ভাগ্যটা ভালই। ফেরার পথেও বাস পেলেন উমাপতি। বাসে বেশ ভিড়ও। রাস্তাঘাট যতটা ফাঁকা ছিল ততটা আর নেই। লোকজন হাঁটাচলা করছে। দেখে উমাপতির আশা হল, টেনশনটা হয়তো বা কাটছে।

নিজের স্টপে নেমে উমাপতি যখন গলির দিকে হাঁটছেন তখন রাস্তার কলে দুই গামছাপরা ছোকরা স্নান করছিল। একজনকে বলতে শুনলেন, কালু হটে গেছে রে।

কালু বা বাদল যে আসলে কে তা উমাপতি জানেন না। না জানলেও চলে। এরা শুধু দুটো নাম মাত্র। কিছুদিন পরপর নামগুলো পাল্টে যায়। নতুন নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে।

শ্রীময়ী প্রায় দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিল। উমাপতি কড়া নাড়বার আগেই দরজা খুলে দিল।

দেরী দেখে যা চিন্তা হচ্ছিল।

উমাপতি টিফিন ক্যারিয়ারটা শ্রীময়ীর হাতে দিয়ে বললেন, বোধহয় টেনসানটা কেটে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে সব ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়।

চন্দনা কি আজ সত্যিই চলে যাচ্ছে, বাবা? একবার বাসায় আসবে না?

না, চলেই যাচ্ছে। জামাই গাড়ি নিয়ে আসবে, খবর পাঠিয়েছে। আমি হাসপাতালের বিল মিটিয়ে দিয়ে এসেছি

মা কিন্তু খুব রাগ করছেন।

উমাপতি হতাশভাবে বললেন, আমাদের ওপর রাগ করে কী লাভ? চন্দনা আর জামাই মিলে ডিসিশন নিয়েছে। রাগ করলে তাদের ওপর করতে বলো।

www.boiRboi.blogspot.com

বলেই চন্দনা আঁতুর না উঠতেই চলে যাচ্ছে।

উমাপতি পাখার তলায় বসে হতাশার একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, তোমার শাশুড়ির ভিতরে অনেক বিষবাষ্প জমে আছে। সেগুলো মাঝে মাঝে যে-কোনও ছুতোয় বেরিয়ে আসে। তা একরকম ভাল। কিছুক্ষণ আমাকে গালাগাল করলে যদি একটু হাল্কা হতে পারেন তো সেটা স্বাস্থ্যকরই। আমার আর ও বিষে কাজ হয় না। অভ্যেস হয়ে গেছে। তুমিও ভেবো না। এতদিনে শাশুড়িকে তো কিছুটা বুঝেছো।

শ্রীময়ী শুকনো মুখে বলল, মার কথায় কিছু মনে করিনি। কিন্তু ভাবছি চন্দনারা যে এভাবে চলে যাচ্ছে সেটা সত্যিই আমাদের দোষে নয় তো? আমিই তো খাবার করে দিতুম।

উমাপতি একটু ভাবলেন, তারপর হাতটা উল্টে বললেন, দোষ ধরলে তো কত দোষই বের করা যায়। সে বেলভিউতে রাখলেও দোষ বের করত। তা নয় মা, ওদের একটু শ্রেণীচেতনা প্রবল হয়েছে। ওটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। আমাদের সাধ্যমতো করেছি।

শ্রীময়ী চিন্তিত মুখে একটু শ্বশুরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, আপনার জন্য একটু গরম জল করে রেখেছি। রসুনতেল করা আছে। ভাল করে তেল মেখে স্নান করে নিন। মা কিন্তু বসে আছেন।

উমাপতি উঠতে গিয়ে টের পেলেন শরীর যেন এক স্তূপ কাঠ। ওঠাতে পারছেন না। হাত-পায়ে দুর্বলতাজনিত একটা কাঁপুনি। মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠলেন। কমলাবালা দুই নাতিকে নিয়ে ছাদে গেছেন শুকনো জামাকাপড় আনতে। এ সময়ে ছাদে গেলে তিনি কিছুক্ষণ বাড়িওলার বুড়ি মায়ের সঙ্গে আড্ডা মারেন।

উমাপতি বুঝতে পারছেন, মনের জোর আস্তে আস্তে শরীরের কাছে হার মানছে। শরীর বড় জীর্ণ, বড় বিকল হয়ে আসছে দিনকে দিন।

এমনিতে তাঁর কোনও অসুখ নেই, কিংবা থাকলেও জানেন না। বহুকাল তিনি রক্তচাপ মাপাননি, ব্লাড-সুগারের কাউন্ট নেননি। ওসব করার মতো বাবুলোক তিনি নন। কিন্তু শেষ সময়টায় যদি বিছানায় পড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে যেতে হয় তবে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। বীরের মৃত্যু তাঁর আর হবে না। না হোক, অন্তত মৃত্যুটা আসুক হঠাৎ, বিনা নোটিশে, চিলের মতো ছোঁ মেরে প্রাণটুকু নিয়ে চলে যাক আকাশে। ঈশ্বর কি এটুকু দয়া তাঁকে করবেন না? বিছানায় পড়লে লজ্জা তো আছেই, তার ওপর কমলাবালা আর শ্রীময়ী আর সরোজ মিলে হয়তো সংসারের ঘটিবাটি গয়নাগাঁটি যা আছে বিক্রি করেও

চিকিৎসা করাবে শেষতক। তাতে লাভ নবঘণ্টা। বরং সংসার ফাঁক হয়ে যাবে। উমাপতি এ-সংসারের আর সর্বনাশ চান না। যথেষ্ট হয়েছে।

রসুনতেল মেখে গরমজলে স্নান করার পর শরীরটা আগের চেয়ে একটু সুস্থ হয়ে উঠছিল। উঠলেও তা স্থায়ী হতে দিলেন না কমলাবালা ছাদ থেকে নেমেই খিটখিট শুরু করলেন, তখন থেকে বলে আসছি, মেয়েটা ভাল ঘরে যখন পড়েছে আর বিয়েতে যখন তোমার গাঁটের কড়ি বিশেষ খরচ হয়নি তখন প্রথম বাচ্চাটা হতে একটু খরচ কোরো। তা শুনলে আমার কথা....

নাগাড়ে চলতে লাগল বাক্যবাণ। সামনের ঘরে বিশ্রাম নিতে শুয়ে উমাপতি এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। কোনওভাবেই যেন স্বস্তি হচ্ছে না। শরীরের ভিতরে একটা কি যেন গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে।

মাঝে মাঝে উমাপতির ইচ্ছে হয়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় হাঁটতে থাকেন। হাঁটতে হাঁটতে যতদূর শরীর বয় ততদূর চলে যান। তারপর বুড়ো জীর্ণ শরীর একসময়ে মুখ থুবড়ে পড়বেই। প্রাণবায়ুও হয়তো বেরিয়ে যাবে। সেটা আত্মহত্যাও হবে না, ইচ্ছামৃত্যু হবে।

শুয়ে শুয়ে শরীরময় অস্বস্তি বোধ করতে করতে হঠাৎ উমাপতির একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ল। একটু আগে হাসপাতালে চন্দনার আয়া যখন এসে খবর দিল যে, বাইরে শুভেন বক্তৃতা করতে মিছিল নিয়ে এসেছে তখন চন্দনার মুখটা হঠাৎ কেমন যেন লালচে হয়ে গিয়েছিল। তখন দেখেও তেমন কিছু মনে পড়েনি। এখন পড়ল। শুভেন যে একদা চন্দনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সেটা ঠিক তখন মনে আসেনি। এখন মনে হচ্ছে হিমাংশুর সঙ্গে না হয়ে যদি শুভেনের সঙ্গেই বিয়ে হত তাহলে বোধহয় নার্সিং হোম বা খাবারের কোয়ালিটি নিয়ে কমলাবালার কাছে এত হেনস্থা হতে হত না তাঁকে।

ভাবতে ভাবতে উমাপতি একটু ঝিমিয়ে পড়লেন। ঘুম এল।

সন্ধের মুখে যখন শ্রীময়ী ডাকল তখনও টের পেলেন, শরীরটা যুতের নেই।

শ্রীময়ী বলল, আজ বড্ড ঘুমোচ্ছেন বাবা, রোজ তো এত ঘুমোন না।

উমাপতি উঠে বসে শ্রীময়ীর হাতে ধুমায়িত চায়ের পেয়ালার দিকে ভীত চোখে চেয়ে রইলেন। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নেওয়ার সাহস হল না। ভয় হল, চায়ের কাপটা তিনি হাতে ধরে রাখতে পারবেন না। হাত কেঁপে পড়ে ভেঙে যাবে।

উমাপতি বললেন, চাটা রেখে যাও মা।

শ্রীময়ী একটা পুরোনো ঠোঙার কাগজ বিছানায় পেতে চায়ের কাপ রাখল। প্লেটে দুটো বিস্কুট। বলল, শরীর ভাল আছে তো বাবা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক হ্যায়।

আপনাকে শরীরের কথা জিজ্ঞেস করে তো লাভ নেই। সর্বদাই বলেন, সব ঠিক হ্যায়।

ঠিকই আছে মা। শরীর নিয়ে বলার মতো কিছু নেই। চলছে, চলবে।

উমাপতির উঠতে খুব কষ্ট হল। কিন্তু উঠলেন এবং বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলেন অনেকক্ষণ।

ঘরে পা দিয়েই তাঁর মনে হল, সরোজ! সরোজ কোথায়?

বউমা!

শ্রীময়ী রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল, যাই বাবা।

সরোজ কি বেরিয়েছে?

শ্রীময়ী তাড়াতাড়ি উঠে এসে বলল, না। রান্নাঘরে আমার কাছে বসে আছে।

রান্নাঘরে?

শ্রীময়ী হাসল, আমার আটা মেখে দিচ্ছে। আজ বেরোতে দিইনি।

তোমার শাশুড়ি?

ছাদে। নাতিদের নিয়ে এসময়ে তো ছাদেই থাকেন।

উমাপতি চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খেতে ভালবাসেন। প্লেটে ঢেলে চা খেতে ভালবাসেন। সেরকমই খেলেন। কিন্তু তেমন স্বাদ লাগল না মুখে। বাইরের অবস্থাটা একবার দেখা দরকার। টেনশনটা কমেছে কিনা একবার দেখে এলে হয়।

উমাপতি লুঙ্গির ওপর একটা জামা চড়িয়ে নিলেন। সদর খুলে গলিটায় মুখ বাড়ালেন। কার্তিকের বেলা মরে সন্ধে লেগে গেছে। গলিটা ফাঁকা। বড় রাস্তায় তেমন কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। তবে বোমার শব্দ নেই।

শরীরের যা অবস্থা তাতে শরীরের ওপর ভর করে বেরোনো চলে না। উমাপতি দম ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনটাকে উস্কে তুললেন। মনই আসল শক্তি। মনই সকল শক্তির উৎস। ভাল মন্দ, সাদা কালো যা কিছু সব তো মনেরই খেলা। মনই সব গড়ে নেয়।

উমাপতি সত্যিই শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলেন। টলমল করছে মাথা, ঢিবঢিব করছে বুক, হাত পা ভেঙে আসছে, তবু উমাপতি পায়ে পায়ে মোড় অবধি চলে এলেন।

রাস্তাঘাট ফাঁকাই, তবে জনশূন্য নয়। দোকানপাট বেশির ভাগ বন্ধ হলেও দুচারটে খোলা আছে। কালীমন্দিরে আরতির শব্দও শুনতে পেলেন। এক দঙ্গল শ্মশানযাত্রী একটা মড়া নিয়ে গেল হরিধ্বনি করতে করতে। একটা বাস আর

www.boiRboi.blogspot.com

দুটো ট্যাক্সি গেল ময়দানের দিকে। ওদিক থেকে এল দুটো লরি, একটা মিনিবাস।

উমাপতি একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। হয়তো গণ্ডগোলটা খুব একটা ছড়ায়নি, ঘোরালো হয়ে ওঠেনি।

স্বপনের সঙ্গে সরোজের বন্ধুত্বটাই তাঁকে আজকাল দুশ্চিন্তায় রাখে। যখন ছোটো ছিল তখন একরকম। কিন্তু এখন তো আর তা নয়। স্বপন বাদলের দলের পাণ্ডা। তার সঙ্গে সরোজের মেশামেশি মোটেই ভাল নয়। তেমন চালাক চতুর ছেলে সরোজ হলে চিন্তা ছিল না। কিন্তু বড় বাস্তববুদ্ধিহীন ছেলে। কষ্ট পাবে, কষ্ট দেবেও।

একটা টেমি জ্বেলে গলির মুখে ফুচকাওলা পরেশ দাঁড়িয়ে আছে। এখনও খদ্দের জোটেনি।

উমাপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর রে পরেশ?

গণ্ডগোল আছে, তবে ওদিকটায় গলির মধ্যে।

স্বপনের কোনও খবর জানিস?

না। তবে কালুর দলে সিধু নামে একটা ছেলে ছিল। সেটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে শুনেছি। নিজের হাতে বোমা বাস্ট করেছে।

আর কিছু?

এখনও কিছু শুনিনি। ওদিকটায় লোডশেডিং। কাল সকালের আগে জানা যাবে না। তবে পুলিশের গাড়ি টহল মারছে।

উমাপতি ফিরে এলেন ঘরে। ছিটকিনি দিলেন। এ পাড়ায় এখনও লোডশেডিং হয়নি। তবে হতে কতক্ষণ! হ্যারিকেনটা চৌকির তলা থেকে বের করে নিবু নিবু করে জ্বালিয়ে রাখলেন। একটু শীত-শীত করছে। সুতির চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন বিছানায়।

শ্রীময়ী আর সরোজ রান্নাঘরে খুব কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে। কমলাবালা ঘরে না থাকলে ওরা খুব হাসে টাসে। উনি থাকলে সব চুপ মেরে যায়। শ্রীময়ী বলেছিল দুরি ফিস খেলবে। উমাপতি অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটা কিছু করলে সময়টা কেটে যায়। কাল সকালে আর চন্দনার খাবার নিয়ে যেতে হবে না। বাঁচোয়া। অনেকক্ষণ ঘুমোবেন।

দেশকাল পরিস্থিতির কথা ভাবতে ভাবতে ঢুলুনি এল।

হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড কড়া নাড়ার শব্দ আর সেইসঙ্গে একটা মেয়েলী গলার চাপা রুদ্ধশ্বাস ডাক, বউদি! বউদি! এই বউদি, দরজা খোলো শিগগির?

উমাপতি চট করে উঠে দরজা খুলে দিলেন। উচিত নয়, প্রথমে জিজ্ঞেস

করে নিতে হয় কে বা কি চায়। দিনকাল তো ভাল নয়। কিন্তু গলার স্বরটা ভীষণ বিপন্ন মনে হল।

কে?

মেয়েটা উমাপতিকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, জ্যাঠামশাই, আমাদের ভীষণ বিপদ। আমি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

উমাপতি চিনলেন। গণেশের মেয়ে। দুটো বাড়ি আগে থাকে। বেশ ডবকা চেহারা। উড়নচণ্ডী গোছের মেয়ে। শরীর দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর ছোঁড়াদের সঙ্গে মসকরা করে। চেহারাটা এখন উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে। গায়ের কাপড়ও ঠিক নেই। হাঁফাচ্ছে। দু চোখে আতঙ্ক।

উমাপতি বললেন, কী হয়েছে তোদের বাড়িতে?

এক দল গুণ্ডা ছেলে ঢুকেছে দরজা ভেঙে। বলছে, স্বপনকে নাকি আমরা লুকিয়ে রেখেছি। বাবাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। আমাকেও ধরত, কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি।

স্বপনের নামে উমাপতি আবার বিবশ বোধ করলেন। স্বপনের সঙ্গে সরোজের মাখামাখিটা মোটেই ভাল হয়নি। উমাপতি দরজায় বাঁঠাম তুলে দিলেন।

রান্নাঘর থেকে শ্রীময়ী এসে অবাক চোখে মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, কী হয়েছে রে সন্ধ্যা?

ওঃ বউদি গো!

বলতে বলতে সন্ধ্যা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। তারপর দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল শ্রীময়ীকে।

উমাপতি একটা শুকনো ঢোঁক গিললেন। তারপর শ্রীময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, সরোজ কি এখনও রান্নাঘরে?,

শ্রীময়ী সন্ধ্যাকে পাশের ঘরে নিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে বলল, হ্যাঁ, আমি বেরোতে বারণ করেছি।

উমাপতি মাথা নেড়ে বললেন, ওর বোধহয় থাকা ঠিক হবে না। ওকে বলো, পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাক।

কেন বাবা?

ওসব কালুর দলের ছেলে। স্বপনকে খুঁজছে। এ বাড়িতেও আসতে পারে।

শ্রীময়ীর মুখটা হঠাৎ পাল্টে গেল। বিবর্ণ, শুকনো, ভয়ার্ত। একটা অস্ফুট শব্দ করে সে পর্দার ওপাশে চলে গেল সন্ধ্যাকে নিয়ে।

www.boiRboi.blogspot.com

উমাপতি দুটো হাত বারবার নিষ্ফল মুঠো পাকাতে লাগলেন। মাউজার পিস্তলটা জমা দেওয়া ঠিক হয়নি। এদেশের সরকার যখন তাঁর বা তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কিছুই করেনি তখন নিজস্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখাটা উচিত ছিল।

উমাপতি ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা বের করে আনলেন। ধুলো আর ঝুল লেগে আছে লাঠিটাতে। বেডকভারের ওপর ঘষে সেটা পরিষ্কার করে নিলেন। অবশ্য কাউকে মারতে গেলে যে লাঠি পরিষ্কার করতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। তবু করলেন কিছু করতে হবে বলেই।

উমাপতি লাঠিটার ওজন এবং কতটা মারাত্মকভাবে সেটা ব্যবহারযোগ্য তা পরীক্ষা করার জন্য শূন্যে মাত্র একপাক লাঠিটা ঘুরিয়েছেন এমন সময় গলিতে ছুটপায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। একজন দুজন নয়, অন্তত দশ বারো জন আসছে। মুখে অশ্রাব্য খিস্তি। খোলা জানালা দিয়ে সবই শোনা যাচ্ছে।

দরজাটা খুলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবেন না কি দরজা আঁট রেখে ঘরেই অপেক্ষা করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেও দেরী হল উমাপতির। তার আগেই দমাদম লাথি পড়তে লাগল দরজায়, এই শালা শুয়োরের বাচ্চা, খানকির বাচ্চা! দরজা খোল শালা....

এই গালাগাল তাঁর উদ্দেশে! অ্যাঁ! তাঁর উদ্দেশ্যে! আশ্চর্য উমাপতি এই দেশকে পরাধীনতামুক্ত করতে, ইংরেজ তাড়াতে লড়াইটা তো বড় কম করেননি। ইংরেজ মেরেছেন, বিশ্বাসঘাতক ভারতবাসী মেরেছেন, জেল খেটেছেন, পুলিশের মার খেয়েছেন বহুবার। এদেশের লোকেরা এতটা নির্লজ্জ আর অকৃতজ্ঞ হয় কি করে?

উমাপতির রিফ্লেক্স কমে গেছে। নইলে তিনি চৌকিটা টেনে দরজায় ঠেকা দিতে পারতেন। সহজ কৌশল। তাতে দরজা ভাঙতে ওদের দ্বিগুণ সময় লাগত। কিন্তু দেশবাসীর অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবতে গিয়ে অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলেছেন।

দুর্বল দরজা ছিটকিনি আর বাঠাম ভেঙে দড়াম করে খুলে গেল। উন্মত্ত চেহারার কয়েকটা ছেলে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল ঘরে।

উমাপতির হাতে লাঠি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটা ধাক্কায় ছিটকে কোথায় যে পড়লেন তা ঠাহর পেলেন না। শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, সরোজ! পালা!

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে নামতে কমলাবালা চেঁচাচ্ছিলেন, ওরে কী হল রে? কী হয়েছে? কারা ঢুকল রে অমন ডাকাতের মতো?

ও বউমা, ও সরোজ....

www.boiRboi.blogspot.com

এত চকিত ঝড়ের মতো ঘটনা ঘটছিল যে হতবুদ্ধি শ্রীময়ী দৌড়ে গিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে সরোজকে বের করে দেওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না। অবশ্য তাতে যে সরোজ বেঁচে যেত এমনও নয়। কালুর দল যে বাড়িতে অবধি হানা দিয়েছে এটা টের পেয়ে সে ঠাণ্ডা, সাদা, জড়বৎ হয়ে গিয়েছিল।

চারটে ছেলে উমাপতির বাধা অতিক্রম করে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকেই সন্ধ্যাকে দেখতে পেল।

শালী! হারামীর বাচ্চা!

বলতে বলতে একজন তার চুলের মুঠি পাকিয়ে ধরে প্রথমে একটা চড় মারল গালে। তারপর পেটে একটা লাথি, বল শালী, সেই শুয়োরের বাচ্চাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

সন্ধ্যা একটা হিক্কা তোলার শব্দ করে মেঝেয় পড়ে গেল, ও বাবা গো!

আর তিনজন ঘর পেরিয়ে রান্নাঘর আর বাথরুমে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারা প্রথম বাধাটা পেল শ্রীময়ীর কাছে। মরীয়া শ্রীময়ী রুটি বেলার বেলুনটা নিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, ভাল হবে না বলছি।

বলতে বলতেই সে বেলুনটা তুলে মারল। মারটা লাগল উন্মত্ত এক ছোকরার বাঁ হাতে। কিছুই নয়। ডানহাতের পিস্তলটা তুলে সে নলটা দিয়ে ঠকাস করে মারল শ্রীময়ীর কপালে। তারপর একটা ঝটকা মেরে শ্রীময়ীকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল এক পাশে।

নিরস্ত্র সরোজ রান্নাঘরে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে। ভাষাহীন, বোবা, বিস্ময়ে ভয়ে জড়বৎ।

এই শুয়োরের বাচ্চা, কোথায় তোর স্বপন বল। বল, নইলে এইখানে লাশ ফেলে যাবো।

সরোজ এ-কথার কী জবাব দেবে? সে শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বোঝাতে চাইল যে, সে জানে না।

দুটো ঘুঁষি পড়ল তার মুখে। দ্বিতীয়টা এত জোরাল যে সরোজের মাথা পিছনের দেয়ালে গিয়ে ঠকাৎ করে ঠুকে গেল। চোখে অন্ধকার দেখে বসে পড়ল সে।

দুজন তাকে টেনে তুলল।

চল শালা, আজ তোকেই ভোগে দিই। চল। ওঠ।

পিছনে একটা লাথি এসে পড়ল।

চল শালা।

বহুকাল সরোজ মার খায়নি। এত হিংস্র মার কখনোই নয়। কিন্তু ওরা

কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ? কোথায় ?

সরোজ চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। কেমন ঘোলাটে ঘোর-ঘোর লাগছে। উল্টো টানে তার চুলগুলো বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরেছে একজন। পটপট করে ছিঁড়ে যাচ্ছে চুলের গোছা। রিভলভারের নলের একটা খোঁচায় কান ছিঁড়ে রক্ত পড়তে লাগল। ধাক্কা, গুঁতো, লাথি, চুলের টান উল্টোপাল্টা নানারকমভাবে ওরা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কমলাবালা বুকফাটা চিৎকার করে লোক ডাকছেন, ওরে তোরা আয় শিগগির....আমার ছেলেকে মেরে ফেলল—মেরে ফেলল....আয়....

কে আসবে ? কেউ এক পাও এগোলো না।

সরোজকে যখন গলিতে নামাল ওরা তখনই সরোজ ঠাণ্ডা ভয়ংকর মৃত্যুকে টের পাচ্ছিল। এরকমভাবে হঠাৎ তার সময় ঘনিয়ে আসবে তা তো কখনও ভাবেনি সে।

ছেলেগুলো অশ্রাব্য খিস্তি করছে। কলার ধরে, চুল ধরে, হাত ধরে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

সরোজ একেবারে শেষ সময়ে নিজের ঘটনাটা বুঝে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল, বউদি ! বাবা ! বউদি ! মেরে ফেলল...বাবা.....মা...

একটা পিস্তলের বাঁট এসে হাঁ-করা মুখে লাগল। ছড়াক করে খানিকটা রক্ত আর আধখানা দাঁত ভেঙে পড়ে গেল। ঘটনাটা ঘটছে তবু যেন ভারী অবিশ্বাস্য লাগে সরোজের। এরকমভাবে কেউ অন্য কারো শরীরকে নির্যাতন করতে পারে। এত নিষ্ঠুরভাবে ? অনায়াসে ?

মুখোমুখি যে মস্ত কারখানাটার টানা দেয়াল গলিটা জুড়ে আছে সেটা বহুদিন ধরে বন্ধ। কানাগলির শেষ দিকটায় কারখানার একটা ছোট্ট লোহার ফটক আছে। সেটা বরাবরই তালাবন্ধ থাকে। সরোজকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ছেলেগুলো।

তাদের একজন গলির বাসিন্দাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, এই শুয়োরের বাচ্চারা, কেউ উঁকি দেবে না বলছি। সব জানালা দরজা বন্ধ করে দে।

বাস্তবিকই জানালা দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। কেউ উঁকি অবধি দিতে সাহস পেল না।

কারখানার ফটকটা আজ কী মন্ত্রবলে যেন খোলা। সরোজকে টেনে হিঁচড়ে সেই ফটকের মধ্যে ঢোকাল ছেলেগুলো। পায়ের তলায় বড় বড় ঘাস টের পাচ্ছিল সরোজ। দীর্ঘদিন অব্যবহারে জায়গাটা জংলা হয়ে আছে। ভারী নির্জন। ভীষণ নিস্তব্ধ।

ছেলেগুলোর পিছু লাঠিহাতে তাড়া করে আসার একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন উমাপতি। কিন্তু শরীর, এই পোড়া শরীর আজ দিল না। মনের জোর যথেষ্ট ছিল। ছেলেকে খুন করতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিবেকশূন্য উন্মাদ কিছু ছেলে, এ সময়ে কোনও বাপেরই মনোবলের অভাব হয় না। কিন্তু মনের অস্বাভাবিক শক্তিতেও জড়বৎ এই শরীর দিল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গলিতে পড়ে ছুটতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে পড়লেন উমাপতি। খুব চোট লাগল গোড়ালি আর কনুইতে। উঠতে গিয়ে দেখলেন, কোমরটাও অসাড়। নিষ্ফল চেঁচাতে লাগলেন, তোমরা কে কোথায় আছো ! বেরিয়ে এসো ! আমার ছেলেকে চোখের সামনে মেরে ফেলছে ! চুপ করে থেকো না, এ বিপদ একদিন তোমাদেরও হবে। একবার রুখে দাঁড়াও সবাই মিলে। ওরা পালাবে !

কথাগুলো পর্যন্ত উমাপতির ঘরঘরে গলায় ভাল করে ফুটল না।

তবে ভরসার কথা শ্রীময়ী, খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেও শ্রীময়ীই শেষ অবধি দৌড়ে বেরিয়ে এল। শাড়ি উড়ছে, চুল উড়ছে। পাগলের মতো সে গিয়ে লোহার ফটক দিয়ে ঢুকল ভিতরে।

ওকে মারবেন না, মারবেন না। ও কিছু করেনি ! স্বপনদার খবর ও জানে না, বিশ্বাস করুন। একটু আগেই আমাকে বলছিল, স্বপন পালিয়ে গেছে...ওর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল—আসেনি...প্লীজ...

হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলছিল শ্রীময়ী। কিন্তু কাকে ? অন্ধকারে বিশাল কারখানার চত্বরে অনেক গোলকধাঁধা। বিশাল বিশাল লোহার যন্ত্রপাতি ছড়ানো চারদিকে, খোলা শেড-এর তলায় বিপুল বয়লার, চারদিকে বুকসমান আগাছা আর ঘাস। এর মধ্যে কোথায় কোন দিকে টেনে নিয়ে গেছে সরোজকে ?

উন্মাদিনীর মতো চারদিকে তাকাল শ্রীময়ী। মনে হল বাঁদিকে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে ছুটল শ্রীময়ী। চিৎকার করতে লাগল প্লীজ...প্লীজ...একজন নিরপরাধকে মারবেন না, ও কিছু করেনি শাঁখা ছুঁয়ে বলছি...মা কালীর দিব্যি...

কিসে পা বেঁধে পড়ল শ্রীময়ী তা সে বলতে পারবে না। মাথাটা ঠুকেও গেল লোহার কোনও যন্ত্রে। কিন্তু ব্যথা টেরই পেল না সে। উঠে দাঁড়াতে গেল। আর সেই মুহূর্তে ঠিক যেদিকে সে ভুলবশে দৌড়ে এসেছে তার উল্টো দিকে, অনেকটা দূরে দড়াম করে একটা শব্দ হল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল শ্রীময়ী। মারল ?

দুম দুম করে আরও দুটো শব্দ হল পরপর। তারপর অন্ধকারে কয়েকটা পায়ের আওয়াজ দৌড়ে অন্য পাশ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

শ্রীময়ী আবার ছুটতে লাগল।

সরোজ! সরোজ! কোথায় তুমি গো? বেঁচে আছো? সাড়া দাও।

সরোজ সাড়া দিল না। কিন্তু শ্রীময়ী ঘটনাস্থলের দিকে ছুটতে ছুটতে যেন তীব্র ইচ্ছাশক্তিবলেই সরোজকে দেখতে পেল। পিছনের দেয়ালের কাছে, ন্যাড়া একটা জায়গায় সরোজ পড়ে আছে।

শ্রীময়ী দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরল দেওরকে, সরোজ! সরোজ! ও সরোজ! সরোজ...

লোহার ফটক দিয়ে কয়েকজন বীর পায়ে ঢুকল ভিতরে। হাতে টর্চ। এরা তত ভীতু নয় পাড়ার লোকেদের মতো। টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিককার গোলকধাঁধার মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হাঁক দিল, সরোজ! কোথায় তুই?

শ্রীময়ী কান্না জড়ানো গলায় বলল, এই যে এখানে! শীগগির আসুন। ভীষণ রক্ত...

টর্চধারীরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল। অগ্রবর্তীজন শুভেন।

এঃ, একটু দেরি করে ফেললাম। বউদি, আপনি বাড়ি যান, আমরা দেখছি। এসব পলিটিক্যাল মার্ডার ট্যাকল করা আমাদেরই কাজ। আপনি গিয়ে উমাপতিদাকে দেখুন। সঞ্জয়, দেখ তো নাড়ীটা...আছে না গেছে...

একজন নাড়ী ধরল। বলল, এখনো আছে।

গুলি কোথায় লেগেছে?

মাথায়, বুকে, একটা বোধহয় তলপেটেও, চান্স নেই।

রাজুর গাড়িটা নিয়ে আয়, দৌড়ে যা। হাসপাতালে রিমুভ তো করি। রাজুকে বলিস পুলিশকে যেন একটা ফোন করে দেয়। ইনফর্মেশন ফ্রম শুভেন বোস—একথাটা যেন বলে, নাহলে পাত্তা দেবে না।

শ্রীময়ী কী করবে বুঝতে পারছিল না। শুধু, সরোজের রক্তে সে ভিজে যাচ্ছিল। কী মার মেরেছে ওকে। চুল ছেঁড়া, দাঁত ভাঙা, শরীরে কতগুলো ফুটো! হায় রে, একটু আগেও রান্নঘরে বসে তার রুটি বেলে দিচ্ছিল!

শুভেনের দলের একটা ছেলে দুঃখিত স্বরে বলছিল, ঝুটমুট মেরে দিয়ে গেল সরোজকে। পাল্টুকে মেরেছে স্বপন তা ও কী করবে। ও তো আর মারেনি।

শুভেন গম্ভীর ভাবে বলল, ডোন্ট আটার নেমস। পরিস্থিতিটা আগে ভাল করে বোঝার চেষ্টা কর। ছেলেগুলোকে চিনতে পেরেছিস?

নাঃ, তবে ওটা কোনও ব্যাপার নয়। ছেলেগুলোকে সবাই চেনে।

শুভেন গম্ভীরভাবে বলল, হুঁ।

শ্রীময়ী ওদের কথা শুনছিল না। মুখ তুলে অসহায়ভাবে বলল, শুভেনদা,

একটু জল এনে দিতে পারেন। সরোজ হাঁ করে আছে। মনে হয় তেষ্টা পেয়েছে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। পটল, ছুটে গিয়ে জল নিয়ে আয় তো।

দেখতে দেখতে জায়গাটায় ভীড় হয়ে গেল। টর্চের পর টর্চ এসে ঢুকছে।

॥ ছয় ॥

এটা জিজার মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীর বেশির ভাগ মেয়েই চলেছে সমকামিতার দিকে। বিশেষ করে কুমারী এবং চাকরিরতা মেয়েরা। পুরুষেরা তো কখনও মেয়েদের পুরোপুরি বোঝে না। মুখে নানরকম মিষ্টি কথা বলে, উইমেনস লিবকে সাপোর্ট করার ভান করে, নারীমুক্তির কথা বলে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনে করে, মেয়েরা দাসী বাঁদী। পুরুষেরা আর অদূর ভবিষ্যতে মেয়েদের সঠিক বুঝবেও না। নিজেদের দাবী-দাওয়া, একতরফা কাম, একতরফা সুপিরিয়রিটি নিয়ে সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে মেয়েদের ওপর। পুরুষের এই স্বার্থপরতা, ওই কর্কশ সাম্রাজ্য ক্রমেই মেয়েরা অপছন্দ করছে। পুরুষ নয়, মেয়েদের প্রতি প্রকৃত সহমর্মিতা একমাত্র মেয়েদেরই আছে, তারাই প্রকৃত টের পায় মেয়েদের দুঃখ কোথায়। আর এই সূত্রেই এখন বিশ্বময় মেয়েদের মধ্যে অলক্ষ্যে শুরু হয়ে গেছে লেসবিয়ানিজম্। টেনিস খেলোয়াড়, গায়িকা, অ্যাথলিট, ওয়ার্কিং গার্লসরা খোলাখুলি স্বীকার করছে, তারা পুরুষসঙ্গীর চেয়ে মেয়ে সঙ্গীই বেশী পছন্দ করে। তারা সমকামী।

অসুস্থতা? নিশ্চয়ই। তবে এই অসুস্থতা সৃষ্টির মূলে পুরুষদেরই অবদান সর্বাধিক। মেয়েদের দুর্বলতর শ্রেণীতে ফেলে দিয়ে পুরুষেরা সেজেছে রক্ষাকর্তা, হিম্যান এবং হিরো। আবার তারাই ধর্ষণকারী, অত্যাচারী, তারাই ভোগপটু। এই অবস্থা চললে নারীমুক্তি আসবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। জিজা জানে, পৃথিবীতে যতগুলো মেয়ে খুন হয় খোঁজ নিলে জানা যাবে তার নব্বই শতাংশই বিবাহিতা। আর এই খুন-হওয়া বউদের হত্যাকারী শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রেই তাদের স্বামী বা স্বামীর নিয়োজিত ভাড়াটে খুনী। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায়ই তা নয়। যত বিবাহিত পুরুষ খুন হয় তার মধ্যে হাজারে হয়তো একজন স্ত্রী বা তার প্রেমিকের হাতে খুন হয়।

অবশ্য জিজার এই পরিসংখ্যান নিতান্তই তার আন্দাজ মাত্র। হিসেবটা হয়তো একটু বাড়িয়ে ধরা। কিন্তু খুব বেশি বাড়ানো নয়।

জিজা আগে একটা মেয়েদের হোটেলে থাকত। যেখানে বয়স্কা কুমারী মহিলার অভাব নেই। বিগতযৌবনা বা পুরুষালী মেয়ের সংখ্যা উদ্বেগজনক

www.boiRboi.blogspot.com

রকমের বেশি। পরিষ্কার ভাবে টের না পেলেও এদের মধ্যে কারও কারও সমকাম-প্রবণতা আছে বলে তার মনে হয়েছে।

জিজা নিজে সমকামী নয়। এ ব্যাপারে তার একটা বিরাগ আছে। কিন্তু তা বলে সে এইসব সমকামীদের ঘেন্নাও করে না। সে জানে, পুরুষদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমবেদনা ও মনোযোগ না পাওয়ার ফলেই এই বিকৃতি।

জিজা এখন চেতলায় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। ছোট্ট দু ঘরের ফ্ল্যাট। জিজা আর সুমিতা এক ঘরে, অন্য ঘরে রাজ আর শমিম নামে আর দুটি মেয়ে। জিজা আর সুমিতা বাঙালী, অন্য দুজনের একজন ইউ পি আর একজন অন্ধ্রের মেয়ে। চারজনই চাকরি করে এবং বেশ ভাল চাকরি। বয়সও বেশ কাছাকাছি। তারা সমান টাকা দেয় ভাড়া এবং মেস বাবদ। পালা করে রাঁধে, বেশ ভাল আছে তারা। সময় পেলে একটু হুল্লোড় বা আড্ডা হয়। শমিম বড়লোকের মেয়ে বলে তার স্টিরিও এবং টিভি আছে। সবাই স্টিরিও শুনে নাচে, টি ভি-তে প্রোগ্রাম দেখে। চারজনের কেউই সমকামী নয় বা সেরকম প্রবণতা কখনও চোখে পড়েনি জিজার। কিন্তু সে এটা লক্ষ্য করেছে যে, কেউই বিয়েতে বিশেষ আগ্রহী নয়। এমন কি প্রেমের ব্যাপারেও একটু উদাসীন। বরং ক্যারিয়ারের ব্যাপারে অনেক বেশি সিরিয়াস।

বলতে নেই জিজার এটা খুব পছন্দ। বিয়ে বা প্রেম জিনিসটাকে সে দুচোখে দেখতে পারে না। তাই টুলু চৌধুরির প্রতি নিজের গোপন দুর্বলতাকে বড্ড ঘেন্না পায় সে।

মনটা আজ একটু অস্থির এবং আড় ছিল জিজার।

যখন বাসায় ফিরল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

দরজা খুলেই শমিম বলল, ইওর ফাদার ইজ হিয়ার। এ থরোলি এনজয়েবল কমপ্যানি। কাম ইন অ্যাণ্ড জয়েন দি ক্রাউড জিজা।

বাবাকে দেখে জিজা মোটেই অবাক হল না। বাবা এরকম হুটহাট চলে আসে। আনন্দে জিজার ভিতরে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল।

পুরুষ মানুষকে জিজা যে এখনও পুরোপুরি ঘেন্না করতে পারে না তা একমাত্র এই পুরুষটির জন্যই। সে মানুষ হয়েছে এই একটি বনস্পতির মতো দৃঢ় গাছের ছায়ায়। জিজা যখন ছোটো ছিল তখন এই মানুষটি ছিল তার খেলার পুতুল। মস্ত, জ্যান্ত এক মজার পুতুল। আস্তে আস্তে যখন বড় হল তখন জিজা দেখল এই প্রকাণ্ড শক্ত সমর্থ চেহারার রাগী ও তেজী পুরুষটি তার কাছে এলেই কেমন যেন জলকাদার মতো নরম হয়ে যায়। জিজার জন্য এই এক মানুষ যখন তখন প্রাণ দিতে পারে, যে কোনও কষ্ট সহ্য করতে পারে, স্বীকার করতে পারে যে

www.boiRboi.blogspot.com

কোনও ত্যাগ। হ্যাঁ, একমাত্র বাবা হিসেবেই বোধহয় পুরুষ মানুষ ভাল। ভীষণ ভাল।

বাবাকে দেখে জিজার নাকের পাটা ফুলে উঠছিল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ, মুখে ফুটে উঠল অপ্রতিরোধ্য আনন্দের হাসি।

শুভংকর সামনের ঘরটায় বসে জমিয়ে গল্প করছিল জিজার তিন বন্ধুর সঙ্গে। কথা বলায় শুভংকর খুবই পটু। এনতার মজার গল্প জানা আছে তার। পাশের টেবিলে চাইনিজ দোকান থেকে আনা চার বাক্স খাবার। নিশ্চিত চিলি চিকেন আর প্রণ ফ্রায়েড রাইস। যখনই শুভংকর আসে তখনই নিয়ে আসে ওসব। আজ তারা রাঁধবে না, গরম করে খেয়ে নেবে।

শুভংকর মুখ ফিরিয়ে মেয়েকে দেখল একটু। ভ্রূ কুঁচকে বলল, বড্ড খাটাচ্ছে নাকি রে? এত রোগা হয়ে গেছিস কেন?

জানো বাবা, আজ চীফ মিনিস্টারের প্রেস কনফারেন্স কভার করলাম।

খবরটা পাশ কাটিয়ে শুভংকর বলল, রোজ দুটো করে পাকা মর্তমান কলা খাবি। সকালে ব্রেকফাস্টের পর একটা করে মাল্টিভিটামিন ক্যাপসুল।

শোনো না বাবা, কাল যাচ্ছি হাওড়ায় অ্যাণ্টিসোশ্যালদের অ্যাকটিভিটি কভার করতে। আমাদের চীফ রিপোর্টার তো কিছুতেই আমাকে পাঠাবে না। বলে, তুমি আমার মেয়ে হলে কি পাঠাতে পারতুম। আমি কি বললাম জানো! বললাম, আমার বাবা হলে কিন্তু ঠিক আমাকে পাঠাত। পাঠাতে না বাবা?

শুভংকর চোখ দুটো ছোটো করে মেয়েকে দেখল। তারপর বলল, না। পাঠাতাম না। হাওড়ায় কী হচ্ছে?

ওঃ, কিছু গুণ্ডামী হচ্ছে। মেনলি সেমি পলিটিক্যাল মার্ডার। গত তিন চারদিনে বেশ কয়েকটা হয়েছে। শুনছি দুটো দলে মারপিট।

সেখানে তোকে পাঠাবে কেন?

আর রিপোর্টার কেউ নেই এখন কলকাতায়।

শুভংকর মুখটা ভোঁতা করে বলল, ভেরি ব্যাড। কাল কখন যেতে হবে? সকালে।

ঠিক আছে। টেক এ ট্যাকসি। যাওয়ার সময় আমাকে হোটেল থেকে তুলে নিবি।

তুমি সঙ্গে যাবে?

হ্যাঁ। কালকের দিনটা যখন থাকছিই তখন—

জিজা একটু লাজুক ভঙ্গিতে বন্ধুদের দিকে তাকাল। বাবার এই বাড়াবাড়ির কোনও মানেই হয় না। তাকে তো আত্মনির্ভরশীল হতেই হবে।

শমিম বলল, হাওড়া ইজ ডেনজারাস। আমার এক আন্টি থাকে ওখানে। একবার তিনিদিন ঘরে আটকে ছিল সবাই। পাড়ায় এত বোমা পড়েছিল।

সুমিতা মাথা নেড়ে বলল, আংকল সঙ্গে গেলে ভালই হবে। জিজা তুমি কিন্তু আজকাল বেশ রিস্ক নাও। রিপোর্টার হতে হলেই কি অতটা রিস্ক নিতে হবে? সেদিন এসপ্লানেড ইস্টে টিয়ারগ্যাস খেয়ে এসেছো। এয়ারপোর্টে সেদিন গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছ।

জিজা বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছিল। বাবার সামনে সব সময়েই নিজেকে তার ছোট্ট মেয়েটি বলে মনে হয়।

রাজ একটু কম কথার মানুষ। এবার হঠাৎ বলল, আংকল, আপনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে একদিনও খেলেন না।

একদিন খাওয়া যাবে। তোমাদের মেসটা তো সবে শুরু হয়েছে। এখনও ভাল করে সেটলই করোনি। পরে হবে।

শুভংকর উঠল। বলল, জিজা, মনে থাকে যেন।

তুমি সত্যিই যাবে বাবা?

আই শ্যাল নট বি ইন ইওর ওয়ে। তুই তোর কাজ করবি আমি জাস্ট সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে থাকব।

জিজা একটু ক্লিষ্ট হাসল। বাবা সঙ্গে যাবে সেটা তার কাছে খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার। কিন্তু বাবা তার নিরাপত্তার ভার নেবে এ ব্যাপারটা জিজার পছন্দ নয়। যদি বাবাই সঙ্গে থাকে তাহলে আর একা একা রিপোর্টিং করার থ্রিল কোথায় থাকবে?

শুভংকর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝল। তাই বলল, ফিলিং আনইজি! হুম, ঠিক আছে, আমি প্রস্তাবটা উইথড্র করছি। কিন্তু কাল ফিরে এসেই আমাকে হোটেলে ফোন করবি। আমি অপেক্ষা করব।

তা কেন বাবা? আমি বরং ফিরে তোমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবো।

উজ্জ্বল মুখে জিজা ঘোষণা করল।

শুভংকর তাতে খুশি হল কিনা বোঝা গেল না। সে কোনও দুশ্চিন্তায় পড়লে তার স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা থোতাপানা হয়ে যায়। কিছুতেই তাতে আর কোনও ভাব খেলে না। আর এই মুড যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ শুভংকর প্রায় কারও সঙ্গেই বিশেষ ভদ্র ও স্বাভাবিক ব্যবহার করে না।

জিজা বাবাকে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিল। শুভংকর মেয়ের সঙ্গে বিশেষ কথা বলছিল না আর। মুড খারাপ।

জিজা শুধু ট্যাকসিতে ওঠার মখে বলল, বাবা, ভয়ের কিছু নেই। ইটস

www.boiRboi.blogspot.com

অলরাইট।

ট্যাকসির দরজায় হাত, শুভংকর একবার ফিরে তাকাল। কিছু বলবে-বলবে করেও না বলে উঠে গেল ট্যাকসিতে।

জিজা একটু হাসল। তার বাবার চেহারায় এখনও রীতিমত তারুণ্যের ছাপ, ত্রিশ বত্রিশের বেশি এখনও মনে হয় না। ইয়া কাঁধ, বিশাল বুকের পাটা, দুখানা পেশীবহুল হাতে অমিত শক্তির আভাস। জিজা শুনেছে তার বাবা যখন বক্সিং করত তখন নামই হয়ে গিয়েছিল, ভয়ংকর শুভংকর।

একটু উদাস মুখে জিজা ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দেখল তার তিন বন্ধুই উত্তেজিতভাবে শুভংকরকে নিয়ে আলোচনা করছে। হোয়াট এ ফ্যানি ম্যান, হাউ হ্যাণ্ডসাম, হাউ ম্যাসকুলাইন ?

শমিম বলল, জিজা, হোয়াই অন আর্থ হি ডাজনট ম্যারি এগেইন ?

জিজা একটু হেসে বলল, আর ইউ ইন লাভ উইথ হিম ?

হোয়াই নট ? উই আর অল ইন লাভ উইথ হিম।

জিজা একটু অহংকারী হাসি হাসল। তার বাবা যেখানে যায় সেখানেই চারদিকে একটা তরঙ্গ ওঠে। একটা প্রবল উপস্থিতি দিয়ে শুভংকর তার পারিপার্শ্বিককে মন্থন করে তুলে আনে নীরব চাটুকারিতা, প্রবল আকর্ষণ, ভয়। হ্যাঁ, ভয়ও।

পাছে জিজার অযত্ন হয় বা সৎ মা এসে অত্যাচার করে সেই ভয়ে শুভংকর বিয়ে করেনি দ্বিতীয়বার। কিন্তু জিজা এখন যথেষ্ট বড় এবং স্বনির্ভরশীল। তার বাবা যদি বিয়ে করে কাউকে, তো জিজা অখুশি হবে না। বরং বাবাকে দেখার একজন লোক হলে জিজা খানিকটা নিশ্চিন্তই থাকবে। কাল একবার লাঞ্চের সময় বলে দেখবে জিজা। সাবধানে বলতে হবে। শুভংকররূপী বোমাটি কখন ফাটে তার তো কিছু ঠিক নেই।

বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করে রাতের খাওয়া সারল জিজা। তারপর খানিক পেপারব্যাক পড়ল। শুল। অনেকক্ষণ ঘুম এল না। টুলু চৌধুরির ব্যাপারে তার একটু ইচিং আছে কি ? থাকলে সেটা সত্যিই বিস্ময়কর।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল জিজা।

ভোরবেলা উঠে কিছুক্ষণ স্কিপিং,কয়েকটাবেন্ডিং, কয়েকটা আসন। জিজার রুটিন।

একটু জলখাবার খেয়ে জিজা বেরিয়ে পড়ল। পরনে ঢিলা কামিজ আর জিনস, পায়ে নরম ক্যাম্বিসের জুতো। মন শরীর দুই-ই বেশ ঝরঝরে। রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল। কালকের কোনও ঘটনারই গভীর কোনও রেশ মাথায় বা

মনে নেই। সাগ্রহে সে আজকের আগামী ঘটনাগুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী, সচেতন, পূর্বধারণা থেকে মুক্ত।

হাওড়ায় এসে যখন নামল জিজা তখনও ভোরবেলার রেশ রয়েছে। ভোর তার বড় প্রিয়। কাঁধের ব্যাগটা সামলে সে আর একটা বাস ধরে যখন হাসপাতালে এল তখনও ভোর একেবারে শেষ হয়নি।

বেলা দশটা নাগাদ হাওড়া পুলিশের বড় কর্তা সাংবাদিকদের **একটা ব্রিফিং** করবেন। তার আগে জিজা হাসপাতাল এবং স্পটগুলো একটু ঘুরে দেখে নেবে, দুচারজনের সঙ্গে কথা বলে ছবিটা তৈরি করতে চেষ্টা করবে। তারপর ব্রিফিং-এর সময় যথাযথ প্রশ্ন করতে অসুবিধে হবে না। একটি বড় পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে পাবলিককে মিট করতে তার একটা গৌরব বোধ হয়। অবশ্য সব খবর যে পরদিন বেরোবে এমন নয়। যতটা লিখবে কাটছাঁট হয়ে বেরোবে হয়তো বা তার এক চতুর্থাংশ। হাওড়ার গুণ্ডামি নিয়ে দেশবাসীর মাথাব্যথা না থাকারই কথা। অনেক বড় বড় সমস্যায় দেশ অহরহ জর্জরিত।

আউটডোরে ভিড়, এনকোয়ারিতে ভিড়। যে-কোনও হাসপাতালই আজকাল ভিড়ে ভিড়াক্কার, রোগভোগের শেষ নেই। প্রয়োজনের তুলনায় হাসপাতালের আজকাল সংখ্যা এতবড় শহরে অতিশয় নগণ্য। কলকাতা আর হাওড়ায় আরও গোটা দশেক বিরাট হাসপাতাল হলে তবে যদি আঁটে।

আইডেন্টিটি কার্ড এবং চোস্ত ইংরিজির জোরে সুপারিনটেণ্ডেন্টের ঘর অবধি পৌঁছোতে জিজার তেমন অসুবিধে হল না। লোকে এখনও ইংরিজিটাকে যথেষ্ট **সমীহ** করে এবং জিজা প্রয়োজন মাফিক মানুষের এই অনাবশ্যক দুর্বলতার সুযোগ নেয়।

এই ঘরেও যথেষ্ট ভিড়। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এখনও আসেননি।

চেয়ারে বসা লোকদের মধ্যে একজন হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, আরে আপনি তো রিপোর্টার! রাইটার্সে আপনাকে কয়েকবারই দেখেছি। কোন পত্রিকার যেন!

জিজা মৃদু হেসে কাগজের নাম বলল।

লোকটা চোখ গোল করে বলল, ভেরি গুড। আমার নাম শুভেন বোস। সোশ্যাল ওয়ার্কার। হাওড়ায় যা ঘটছে তা কোনও খবরই আপনাদের কাগজে বেরোচ্ছে না কিন্তু। প্লীজ, একটু ডিটেলে আমাদের খবরটা দিন। কাল রাতে...আরে, আপনি বসুন না, বসুন।

লোকটা নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটা একটু সরিয়ে জিজাকে বসতে দিল।

জিজা বসল, বলল, আমাদের হাওড়ার করেসপণ্ডেণ্ট ছুটিতে থাকায় আমরা কভার করতে পারিনি। কী হচ্ছে বলুন তো?

যা হচ্ছে সব আমি নিজের লেটারহেডে ডিটেলসে লিখে আপনাদের চীফ রিপোর্টারকে পরশু দিন দিয়ে এসেছি। চিত্তদা আমাকে পার্সোন্যালি চেনেন। আমার নাম বলবেন, শুভেন বোস। নামটা প্লীজ নোট করে নিন।

জিজা তার প্যাডে নামটা লিখে নিল।

শুভেন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কাল রাতে আমার দলের একটি ছেলেকে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে...ওফ...সে কী কাণ্ড...অলমোস্ট আমার নাকের ডগাতেই হয়ে গেল ব্যাপারটা। ওদের পাড়ার একটা মেয়েকেও সাঙ্ঘাতিক মারধর করা হয়েছে। কোনও প্রশাসন নেই, পুলিশ নেগেটিভ, পার্টিরা সব কিপিং মাম। আপনারা যদি না লেখেন তাহলে—

জিজা মৃদু হেসে বলল, আপনি চিত্তদাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন বলেই বোধহয় উনি আমাকে আজ পাঠিয়েছেন।

শুভেন উজ্জ্বল হল। বলল, চিত্তদা আমাকে অনেকদিন ধরে চেনেন। এ অঞ্চলে আমি প্রায় একা হাতে অ্যান্টিসোশ্যালদের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছি। লাইফ রিস্ক নিয়েও।

জিজা লোকটার চেহারা দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না যে লোকটা লড়িয়ে। রোগা, শুঁটকো, একরত্তি চেহারা। জিজার সঙ্গেই পাঞ্জা লড়লে পারবে না।

জিজা নোট নিতে নিতে বলল, কাল যে ছেলেটি মার্ডার হয়েছে তার কী নাম?

শুভেন মাথা নেড়ে দুঃখিতভাবে বলল, সে এখনও মরেনি। তবে বেশিক্ষণ নয়। নাম সরোজ চক্রবর্তী। বেকার ছেলে, কিন্তু ডেডিকেটেড ওয়ার্কার।

বাড়িতে ঢুকে টেনে নিয়ে মেরেছে বলছেন?

হ্যাঁ। ছেলেটির বাবা একজন ফ্রিডম ফাইটার। চিত্তদা তাঁকে চিনবেন। উমাপতি চক্রবর্তী।

জিজা একটু থমকাল, কোন্ উমাপতি বলুন তো! একজন যিনি ফ্রিডম ফাইটার্স পেনশন রিফিউজ করেছিলেন?

তিনিই।

ইজ হি অ্যালাইভ?

হ্যাঁ। এখন উনি হাসপাতালেই আছেন। মিট করবেন?

নিশ্চয়ই।

বসুন, আমি খুঁজে নিয়ে আসছি।

www.boiRboi.blogspot.com

তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল শুভেন। জিজ্ঞা অপেক্ষা করতে লাগল। শুভেন বোস নামটাও তার অচেনা নয়। বিভিন্ন ব্যাপারে কয়েকবার সহকর্মীদের মুখে নামটা শুনেছে সে। লোকটা সম্ভবত নিজেকে প্রোজেক্ট করতে ভালবাসে। তবে ইনফর্মেশনও নিশ্চয়ই রাখে। অপেক্ষা করতে করতে জিজা ঘরে অপেক্ষমান লোকদের চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বেশির ভাগ লোকই তাকে দেখছে। একটু বিস্ময়ভরা চোখ। প্রত্যেকের মুখই শুকনো বা গম্ভীর, বিষণ্ণ বা আত্মবিশ্বাসহীন। এরা কেন অপেক্ষা করছে তা জিজা জানে না। হাসপাতালে, সরকারী অফিসে, রেশনের দোকানে, রেলের বুকিং কাউন্টারে, রেজিস্ট্রি অফিসে, হাওড়ায়, শিয়ালদায়; বাসের লাইনে হাজার হাজার লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা আর অপেক্ষা করে। প্রতিদিন। এই দেশের লোক এই একটা জিনিস খুব ভাল পারে। অপেক্ষা করা।

শুভেন দ্রুত পায়ে ফিরে এসে বলল, আসুন আমার সঙ্গে। উনি বারান্দায় বসে আছেন। একটু ইনকোহেরেন্ট। কাল থেকে উনিও শক্‌ড।

জিজা শুভেনের সঙ্গে বেরিয়ে এল। বারান্দার সিঁড়িতে নিতান্ত দীনদরিদ্রের ভঙ্গিতে যিনি বসে ছিলেন তাঁকে ফ্রিডম ফাইটার বলে মনেই হয় না। আর পাঁচজন সাধারণ অর্থী প্রার্থীর মতোই চেহারা। চোখের কোল বসা, গালে বাসি দাড়ি, গায়ে একটা পানজাবি, পরনে ময়লা ধুতি। একটা থামে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলেন।

শুভেনকে ইঙ্গিতে চুপ করিয়ে জিজা উমাপতির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে নরম স্বরে ডাকল, বাবা!

উমাপতি লাল টকটকে দুটো চোখ মেলে চাইলেন। কিছু বললেন না।

জিজা খুব আদুরে গলায় বলল, বাবা, আমি খবরের কাগজ থেকে আসছি। আপনি আমাকে কিছু বলবেন না?

উমাপতি ধমকে উঠলেন না বা থম ধরেও রইলেন না। স্বাভাবিক একটু ঘরঘরে গলায় বললেন, কেন বেঁচে ছিলাম এতদিন জানো? এই পুত্রশোকটা পাওয়ার জন্য। আমিও তো মায়ের কোল খালি করেছি। কর্মফল কাটাতে হবে না?

ঘটনাটা যদি একটু বলেন। কারা মার্ডার করতে এসেছিল?

উমাপতি হাত উল্টে একটা হতাশার ভঙ্গি করে বললেন, নিয়তি। মানুষ নিমিত্ত মাত্র। ওসব ওই শুভেনকে জিজ্ঞেস করো। ও বলতে পারবে।

আমি আপনার কাছ থেকে যদি একটু শুনতে চাই? বলবেন না বাবা?

তোমার মতো বয়সের মেয়েরা আজকাল অচেনা লোককে বাবা বলে না।

জিজা নরম গলায় বলল, আপনি অচেনা কেন হবেন? আপনি যে ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন। আপনাকে বাবা ডাকতে ইচ্ছে করল বলে ডাকলাম।

উমাপতি কিছু কোমল হলেন, কিছু সদয়। মাথা নেড়ে বোঝালেন যে, তিনি জিজার যুক্তি বুঝতে পেরেছেন। নিজের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি মার্ডারারদের নাম চাও? কি করবে? খবরের কাগজে তো ছাপতে পারবে না। আর ছাপলেও কিছু হবে না। পুলিশ ছোঁবেও না ওদের।

আজ হাওড়ার পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে প্রেস কনফারেন্স আছে। আমি ওঁকে বলব।

উমাপতি সামনের দিকে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, পুলিশ কিছুই করবে না, জানি। বলে লাভ নেই। তাছাড়া ওদের ধরারও দরকার নেই, যদুবংশ নিজে থেকেই ধ্বংস হবে।

আপনার ছেলে কি পলিটিক্যালি ইনভলভড?

না। কোনওকালেই না। ভীষণ ভীতু, লাজুক আর ঘরকুনো ছেলে।

শুভেনবাবু বলছিলেন আপনার ছেলে নাকি ওঁর দলের ডেডিকেটেড ওয়ার্কার।

মিথ্যে কথা। শুভেন একটা ছাগল।

শুভেন একটু দূরে কার সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজিত কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে কান নেই। কান দিলে তার চলেও না। তার হাজারটা চেনা, হাজার রকমের ফিকির।

জিজা সন্তর্পণে প্রশ্ন করল, শুভেনবাবু কি খুব মিথ্যে কথা বলেন?

খুব। আজকাল অবশ্য সবাই বলে, ওর আর দোষ কী। তবে ছেলেটা এমনিতে খারাপ নয়। লোকের দায়ে দফায় দেখে।

উমাপতির দিকে তাকিয়ে জিজা বুঝতে পারছিল, লোকটা অতিশয় ক্লান্ত, দুর্বল, মানসিক টেনশনে ভারসাম্যহীন। তবু কোথাও একটা দৃঢ়তা ইস্পাতের তারের মতো টান হয়ে আছে ভিতরে। ছেলে মৃত্যুশয্যায়, তাও নিজেকে যথেষ্ট সংবরণ করে রেখেছেন।

জিজা নোটবই বন্ধ করে বলল, বাবা, আমি কি আপনার ছেলেকে একবার দেখতে পারি?

দেখবে! দেখ গিয়ে। বলে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ডাক্তাররাও কম মিথ্যেবাদী নয়। সকাল থেকে বলছে বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেলেই রিকভার করবে। দেয়ার ইজ হোপ। এখনও ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয়নি। ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো দেখেছি, মাথায় বুকে আর

www.boiRboi.blogspot.com

তলপেটে মেরেছে ওকে। রোগা দুর্বল ছেলে, এ ধাক্কা ওর সামলানোর কোনও আশাই নেই। রক্তও গেছে কলসি কলসি।

আমি একটু দেখব বাবা, আপনি সঙ্গে যাবেন?

উমাপতি দিশাহারার মতো বললেন, আমি! আমি আর কী দেখব? আমার তো আর কিছু দেখার নেই। শুধু মুখাগ্নি করা ছাড়া আর কিছু করারও নেই।

উমাপতি কথাটা বলে একটা হেঁচকির মতো শব্দ করলেন। সেটা হয়তো কান্না নয়, কিন্তু অস্বাভাবিক একটা কোনও আবেগকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে।

জিজা ত্বরিৎ পায়ে উঠে বেরিয়ে গেল। ফটকের বাইরে একজন ডাবওলাকে দেখেছিল সে ঢোকার সময়। দরদস্তুর না করেই একটা ডাব কিনে মুখটা কাটিয়ে স্ট্র ভরে নিয়ে এল উমাপতির কাছে।

এটা খেয়ে নিন। মনে হচ্ছে সকাল থেকে আপনি কিছু খাননি।

উমাপতি অবাক হয়ে বললেন, খাবো! বলো কী?

ডাবের জলটুকু খেয়ে নিন। প্লীজ।

উমাপতি প্রথমটায় হাত গুটিয়ে রইলেন। কিন্তু বুকজোড়া তেষ্টায় তিনি অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট পাচ্ছেন। এতক্ষণে কষ্টটাকে বোধ করতে পারলেন ভিতরে। ডাবটা নিয়ে এক লহমায় শুষে নিলেন জলটা। খোলটা সাবধানে সিঁড়ির ধারে নিচে ফেলে দিয়ে বললেন, তুমি সরোজকে দেখতে চাও তো! চলো।

দেখতে দেবে তো?

শুভেন সঙ্গে আছে। ওর ইনফ্লুয়েন্সে কাজ হয়।

জিজা শুভেনকে ডেকে বলল, সরোজবাবুকে আমি একটু দেখতে চাই।

শুভেন করুণ মুখে বলল, দেখবেন তো, কিন্তু ও তো কোনও ইন্টারভিউ দিতে পারবে না। ডীপ কোমা।

জানি। আমি শুধু একবার দেখব ফর অথেন্টিসিটি।

আসুন।

বাস্তবিকই শুভেন অনায়াসেই তাদের নিয়ে এল ইমার্জেন্সির ভিতরে। চারদিকে থিক থিক করছে রুগী। খাটে, মেঝেয়, সর্বত্র। নোংরা ঘিনঘিনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তবে জিজা এতে অভ্যস্ত। এরকমই তো হওয়ার কথা এদেশে।

দেয়াল ঘেঁসে একটা লোহার খাটে সরোজ শুয়ে আছে। হাতে নল, নাকে নল, ব্যাণ্ডেজে মাথা প্রায় মোড়া। বুকের ব্যাণ্ডেজে এখনও একটু রক্তের ছোপ।

www.boiRboi.blogspot.com

চাপা গলায় শুভেন বলল, এ ম্যাটার অফ আওয়ার্স।

জিজা চটপট তার নোট বইতে ভিকটিমের বিবরণ লিখে নিল সংক্ষেপে। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। ডেলিকেট হেলথ। ফর্সা।

ওঁর কোয়ালিফিকেশন কী বলুন তো, কোথায় চাকরি করছেন?

উমাপতি পাশ থেকে বললেন, বি এসসি পাশ। চাকরি কোথায় পাবে, টিউশনি করত। আর ক্যান্টিন সাপ্লাইয়ের একটা ছোট্ট বিজনেস ছিল।

জিজা হেসে বলল, আপনি পাস্ট টেনসে কথা বলছেন কেন বাবা? উনি তো এখনও বেঁচে আছেন।

হ্যাঁ, তবে বেশীক্ষণ তো নয়। পাস্ট টেনস হতেই চলেছে!

জিজা ঘড়ি দেখে বলল, আমাকে ট্রাবলের স্পটগুলোয় একটু ঘুরে দেখতে হবে।

শুভেন সাগ্রহে বলল, আমি নিয়ে যাবো আপনাকে। চলুন।

জিজা চলে যাওয়ার মুখে একবার সরোজের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠল।

ডীপ কোমায় আচ্ছন্ন, আসন্নমৃত্যু ছেলেটি হঠাৎ পট করে তাকাল। সোজা তার দিকে।

ও কী! বলে চাপা আর্তনাদের শব্দ করল জিজা।

শুভেন উদ্বেগের গলায় বলল, কী হয়েছে?

সরোজের চোখ আবার বন্ধ। জিজার কি ভুল হল? দেখার ভুল?

জিজা মাথা নেড়ে বলল, কিছু না! চলুন।

বাইরে যখন বেরিয়ে এল জিজা তখনও তার খটকা গেল না। চোখের ভুল তার হতেই পারে না। সরোজ চোখ খুলে চেয়েছিল ঠিকই। তবে সেটা চেতনা অবশ্যই নয়। হয়তো চোখের রগ বা মাংসপেশীর কোনও সংকুচন বা প্রসারণের ফল। কিন্তু সেই চোখের এক পলকের চাউনিতে আরও একটা কিছু দেখেছে জিজা। সেটা কি রাগ? ঘৃণা? বিদ্বেষ? তীব্রতা?

জিজা বলল, শুভেনবাবু এক মিনিট ওয়েট করুন। বোধহয় উটপেনটা ভিতরে ফেলে এসেছি।

উমাপতি আর শুভেনকে দাঁড় করিয়ে রেখে জিজা অত্যন্ত দ্রুত পায়ে ফিরে এল সরোজের কাছে। সরোজ তেমনি শুয়ে আছে। মৃত্যু বেশী দূরে নয়।

জিজা বিছানার ওপর ঝুঁকে মৃদু স্বরে বলল, আপনি কি কনশাস রয়েছেন? যদি থাকেন, প্লীজ, ডান হাতের ফোর ফিঙ্গারটা একটু নাড়ুন।

জিজা সরোজের ডান হাতের তর্জনীর দিকে চেয়ে রইল। প্রথমটায় কিছু হল না। জিজা যখন হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছে তখনই হঠাৎ আঙুলটা বাঁকা অবস্থা থেকে সটান সোজা হল। আবার কুঁকড়ে গেল।

মাই গড !

জিজা অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইল সরোজের দিকে। এবার তার মনে হল, কোনও অত্যাশ্চর্য কারণে মারাত্মক ক্ষত সত্ত্বেও ছেলেটা যে শুধু বেঁচে আছে তাই নয়, বেঁচে থাকার ব্যাপারটাকে মৃত্যুর ভান দিয়ে আড়াল করছে।

জিজার মাথাটা সামান্য ঘুরে গেল। এ কি অলৌকিক কিছু ? অবিশ্বাস্য কিছু ? না, সে অলৌকিক বিশ্বাস করে না।

জিজা চাপা স্বরে বলল, দুপুরবেলা আমি আর একবার আসব।

আপাদমস্তক শিহরিত হয়ে জিজা শুনতে পেল সরোজের গলা থেকে অনুরূপ চাপা একটা শব্দ বেরিয়ে এল, তিনটেয়।

জিজা খানিকটা অসংলগ্ন পায়ে রুগীর ভীড় থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একজন নার্সকে পেয়ে গেল। তাকে ধরে সে জিজ্ঞেস করল, ওই কোণের যে রুগী, সরোজ চক্রবর্তী, তার কি কণ্ডিশন জানেন ?

নার্স বলল, গ্রেভ। বেশীক্ষণ নয়।

তবু ইনজুরি কিরকম ?

ফ্যাটাল। প্রেসার নেমে যাচ্ছে। দু এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।

আমি কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন ?

হ্যা। সরোজ চক্রবর্তী, উমাপতি চক্রবর্তীর ছোটো ছেলে। ওকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি। আমাদের পাড়ার। কাল যখন সন্ধেবেলা ডিউটি করে বাসায় ফিরেছি তখনই তো গুণ্ডারা নিয়ে গিয়ে ওকে গুলি করে। তলপেট বা বুকের ইনজুরি তেমন ডীপ নয়। শুধু ল্যামোরশন। কিন্তু হেড ইনজুরিটাই ফ্যাটাল।

জিজা ধন্যবাদ দিয়ে ভীষণ চিন্তিত মুখে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল।

পেনটা পেয়েছেন ?

জিজা শুভেনের দিকে চেয়ে বলল, পেন ? ওঃ হ্যাঁ, পেন। পেয়েছি। আমার ব্যাগেই ছিল।

উমাপতি আবার সিঁড়িতে যথাস্থানে গিয়ে বসলেন। জিজা শুভেনের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

॥ সাত ॥

পাড়ার ডাক্তার এসে সকালবেলায় ইনজেকশন দিয়ে কমলাবালাকে ঘুম

পাড়িয়ে রেখে গেছেন। কমলাবালা সারা রাত বুক চাপড়েছেন আর চেঁচিয়ে কেঁদেছেন। পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছিল ঘরে। সকালে বুকে ব্যথা ওঠে। ডাক্তার আসে। সেই থেকে কমলাবালা নিঃসাড়ে পড়ে আছেন বিছানায়।

শ্রীময়ী বিপর্যস্ত হচ্ছে দুই ছেলেকে নিয়ে। যমজ দুই ভাই লব আর কুশ জ্ঞানবয়সে কখনও ঠাকুমাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকেনি। তারা খায় ঠাকুমার হাতে, ঘুমোয় ঠাকুমার কাছে, খেলে ঠাকুমার কাছে বসে। সাড়ে তিন বছরের দুটি ছেলে আজ বড় আতান্তরে পড়েছে।

শ্রীময়ীর সঙ্গে ছেলেদের তেমন বনিবনা নেই। কমলাবালা বেঁচে থাকতে ঘটেও উঠবে না সেটা। তাই শ্রীময়ী আজ বড় বিপদে পড়েছে।

রক্তমাখা সরোজকে নিয়ে গেছে কাল রাতে। আজ এত বেলা অবধি কোনও আশার খবর নেই। শ্বশুরমশাই গিয়ে বসে আছেন হাসপাতালে। আসছেন না। শ্রীময়ীর বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে দহনে। হাত পা বশে থাকছে না, তার হাঁটুতে, কনুইতে, কপালে প্রচণ্ড কালশিটে পড়েছে। সর্বঅঙ্গে হাজারটা ফোঁড়ার যন্ত্রণা। মেয়েমানুষ কি পারে ওই হরযুদ্ধ করতে ? তবু শ্রীময়ী লড়েছিল অনেকক্ষণ। পারল না। অতগুলো অস্ত্রধারী ছেলের সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ যুঝবে কি করে ?

সরোজ কি মরে যাবে ? জ্বলজ্যান্ত ছেলেটা, বউদির ন্যাওটা, লাজুক, ভীতু সরোজ সত্যিই মরে যাবে ? কাল রাতে যখন গুলি খাওয়ার পর সরোজের মাথাটা ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিল শ্রীময়ী, তখন সরোজ একটুও ছটফট করেনি। শান্তভাবে শুয়ে শরীর থেকে রক্ত উগড়ে যাচ্ছিল শুধু। কত যে রক্ত থাকে মানুষের শরীরে !

শ্রীময়ীর তখন সঠিক বাহ্যচেতনা ছিল না। একটা বিকারের মতো অবস্থা। সরোজের রক্তে সে প্রায় স্নান করেছিল। যখন ওরা ধরাধরি করে গাড়িতে তুলছিল ওকে তখনই, হ্যাঁ তখনই হঠাৎ শ্রীময়ী সরোজের গলা পেয়েছিল, আসব বউদি।

নিশ্চয়ই ভুল। ওই অবস্থায় অত স্বাভাবিক গলায় কেউ কথা বলতে পারে। হয়তো আর কেউ বলেছিল। শ্রীময়ী সরোজের গলা বলে ভুল করেছে। শ্রীময়ী সরোজের মাথাটা নিজের বুকে জাপটে ধরে রেখেছিল সে সময়ে। হঠাৎ যেন মনে হল, সরোজ বলল, আসব বউদি।

সারা রাত ভেবেছে শ্রীময়ী। ঘরময় লোকজন, উত্তেজিত আলোচনা, স্তোকবাক্য, তার মধ্যেই শ্রীময়ী বসে বসে ভেবেছে। আজও ভাবছে।

কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া ছেলে দুটো ভাবতে দিচ্ছে কই ? সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যান

www.boiRboi.blogspot.com

আর প্যানপ্যান। শ্রীময়ীর হাতে কিছুই তাদের পছন্দ নয়। তার হাতে খাবে না, তার হাতে স্নান করবে না, দাঁত মাজবে না। প্রতিটি কাজ করাতে হচ্ছে চোখ রাঙিয়ে আর মেরে ধরে। মাঝে মাঝে বারণ সত্ত্বেও দু ভাই গিয়ে ঠাকুমার মাথার কাছে বসছে। ডাকছে। চোখের পাতা টেনে খোলার চেষ্টা করছে।

দুটি ছেলেকে নিয়ে তাই নাজেহাল হচ্ছে শ্রীময়ী। নিজের খিদেতেষ্টার কথা সে ভুলতে বসেছে। কিন্তু শরীর শোধ নিতে ছাড়বে কেন? ভীষণ এক অবসাদ শরীরে ভর করে আছে।

হাসপাতালে যাওয়ার সম্ভাবনা তার নেই। কমলাবালা অসুস্থ, দুরন্ত দুটি ছেলে সামলানো। তবু তার মধ্যেই একবার সন্ধ্যার খবর নিয়েছে শ্রীময়ী। সন্ধ্যা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে বারবার। তলপেটে কাল ওকে লাথি মেরেছিল একটি ছেলে। কি হবে কে জানে।

স্বপনকে যদি এখন হাতের কাছে পেত শ্রীময়ী তাহলে তাকে দুকথা শুনিয়ে দিত। স্বপনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলেই সন্ধ্যার আজ এই অবস্থা, সরোজও বলল।

এমনিতে স্বপনকে কখনও খুব খারাপ লাগত না শ্রীময়ীর। হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছেলে। একটু রোখাচোখা এই যা। গুণ্ডামি নিশ্চয়ই করত, নইলে অত তাড়াতাড়ি এত পয়সা করল কি করে? তবে সেসব ছিল বাইরের ব্যাপার। উমাপতি বাড়িতে থাকলে ইদানীং কখনও আসত না এ বাড়িতে। তবে উমাপতি না থাকলে মাঝে মাঝে এসে হানা দিত। চা খেত, গল্প করত। কিছুতেই বুঝতে পারত না শ্রীময়ী যে ওর একটা অন্য রূপ আছে। সেটা খুব ভাল নয়। এ বাড়িতেই সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হত ওর। দুজনে কারখানার ফটক ডিঙিয়ে ভিতরের পরিত্যক্ত নির্জনতায় গিয়ে বসতও কখনও কখনও। শ্রীময়ীর তেমন খারাপ মনে হত না ব্যাপারটা। জানত ওদের বিয়ে হবেই। সন্ধ্যার খবরটা স্বপনের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার, সরোজের খবরটাও।

পাড়ার একটা ছেলেকে শ্রীময়ী ধরে করে পাঠিয়েও ছিল স্বপনের বাড়িতে। সে ফিরে এসে বলল, ও পাড়ায় খুব গণ্ডগোল। স্বপনদা কাল থেকে ফেরার।

শ্রীময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সংসারের কাজ করে গেছে যন্ত্রের মতো। পাণ্টু নামে যে ছেলেটা খুন হয়েছে, গুজব হল, তাকে খুন করেছে স্বপন। তবু সরোজের ওপর এই বদলা নেওয়ার কোনও মানেই শ্রীময়ী খুঁজে পায়নি ভেবে ভেবে। সরোজ তো আর স্বপনের ওরকম বন্ধু ছিল না।

দুপুরে নাইয়ে খাইয়ে দুটি ছেলেকে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াল শ্রীময়ী। পাড়ার লোক আজও খোঁজ খবর নিতে আসছে।

দুটো ছেলে এল দুপুরের একটু পর। চেনা ছেলে। কড়া নাড়তে দরজা খুলে শ্রীময়ী বোবা চোখে চেয়ে রইল। খারাপ খবরই হবে।

দুজনের একজন বলল, সরোজদা এখনও টিকিং।

তার মানে?

বেঁচে আছে।

বাঁচার আশা আছে?

ডাক্তাররা তো বলছে—

বাবা কি এখনও হাসপাতালে? ওঁর শরীর কিন্তু ভীষণ খারাপ।

বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছি। একটা জিনস-পরা মেয়ে একটা ডাব এনে খাওয়াল। শুনলাম মেয়েটা নাকি বড় কাগজের রিপোর্টার।

শ্রীময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কাল ওই গণ্ডগোলে ওঁরও চোট লেগেছে।

কি করব বউদি? উনি তো আসবেন না কিছুতেই।

তোমরা একটা কাজ করবে ভাই? আমি টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার দিচ্ছি, ওঁকে দিয়ে আসবে?

দিন না। আমরা ওয়েট করছি।

শ্রীময়ী রান্নাঘরে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে ম্লান মুখে বলল, থাকগে। দিয়ে লাভ নেই। উনি খাবেন না। তার চেয়ে আমি পয়সা দিচ্ছি, তোমরা ওকে এক আধটা ডাবের জল খাইয়ে দিও।

শ্রীময়ী খুঁজে পেতে পাঁচটা টাকা এনে দিল। ছেলেগুলো চলে গেল।

শ্রীময়ী দুবার স্নান করেছে। আর একবারও করল। তবু শরীর জুড়োচ্ছে না। কাল থেকে এত কেঁদেছে যে, গলায় ব্যথা, চোখে অস্বস্তি। শরীর থেকে থেকে কেঁপে উঠছে ভয়ে, অনিশ্চয়তায়।

সদর দরজা সারাদিন খোলাই আছে। কে যেন কড়া নাড়ল।

শ্রীময়ী গিয়ে দেখল, শুভেন।

বউদি, এক বড় পত্রিকার রিপোর্টার এসেছেন। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবেন। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি। বলে শুভেন মেয়েটিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

এগিয়ে এল একটি মেয়ে। জিনস-পরা, গায়ে কামিজ। বেশ তীক্ষ্ণ চেহারা। এইসব মেয়েকে দেখলে শ্রীময়ীর হিংসে হয়। চাকরি করছে, রোজগার করছে, ঘুরছে, ফিরছে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশছে! কী স্বাধীনতা, কী আনন্দের জীবন!

ফ্যাঁসফেঁসে ভাঙা গলায় শ্রীময়ী বলল, আসুন ভাই।

www.boiRboi.blogspot.com

পোশাক যাই হোক, মেয়েটা কিন্তু দারুণ ভদ্র। হাতজোড় করে নমস্কার করল, সুন্দর একটু হাসলও। ঘরে ঢুকল জুতো সিঁড়িতে খুলে রেখে।

ঘুরে ঘুরে দুটো ঘর আর রান্নাঘর দেখল জিজা। গুণ্ডারা কী করেছিল, কোথা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সরোজকে, সরোজ কতটা প্রতিরোধ করেছিল এইসব টুকটাক জানতে চাইছিল জিজা।

শ্রীময়ী ধরা গলায় বলল, ঝড়ের মতো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কী হয়েছে তা তো মনে নেই। সারা রাত আমাদের ঘুম নেই, খাওয়া নেই। শ্বশুরমশাই সেই রাত থেকে হাসপাতালে বসে আছেন।

জানি। ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

আচ্ছা, আপনিই কি ওঁকে একটা ডাব খাইয়েছিলেন?

জিজা লাজুক হেসে বলল, আপনাকে কে বলল?

দুটো ছেলে এসে বলে গেল। উনি কাল রাত থেকে কিছুই খাননি এত বেলা অবধি। আপনি যে ওকে একটা ডাব খাওয়াতে পেরেছেন তাই ঢের।

জিজা মৃদু হেসে বলে, আপনি আপনার শ্বশুরকে খুব ভালবাসেন, না? ওঁর মতো মানুষ হয় না।

দেওরকেও বোধহয়?

শ্রীময়ী একথায় ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আঁচলে চোখ মুছে অনেক কষ্টে কাঁপানিটা চাপা দিল।

জিজা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুর, দেওর এই শব্দগুলোকে সে বরাবর অপছন্দ করে। শ্বশুরবাড়ি মানেই তার মনে হয় স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার যূপকাষ্ঠ বিশেষ। স্বামী শব্দটাও তার ভিতরে একটা বিরাগ এনে দেয়। কিন্তু এই কচি বউটার শ্বশুরবাড়ির ওপর এই টান দেখে সে অবাক এবং হয়তো বা একটু বিরক্তও হল।

জিজা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনার দেওর সরোজবাবু কি খুব টাফ ধরনের লোক? বেশ স্ট্রং এণ্ড স্টাউট? শক্তপোক্ত?

শ্রীময়ী মাথা নেড়ে বলল, মোটেই না। বরং একদম উল্টো। খুব ভীতু, মুখচোরা, নরম মনের মানুষ।

জিজা ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিত মুখে শ্রীময়ীর দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, উনি কতটা চোট পেয়েছেন বলে আপনার মনে হয়?

শ্রীময়ী কাঁদছিল আবার। ধরা গলায় বলল, গুণ্ডারা ঘর থেকে টেনে নেওয়ার সময়েই ওকে ভীষণ মারছিল। রাস্তাতেও মারে। সে কী ভীষণ নৃশংস মার। শেষে সামনের ওই বন্ধ কারখানায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে। তিনটে। কয়েক

কলসি রক্ত পড়েছে।

হাসপাতালেও আমাকে জানানো হয়েছে ওঁর ইনজুরি ফ্যাটাল। কিন্তু...

জিজা চিন্তিতভাবে চুপ করে যায়।

শ্রীময়ী উন্মুখ হয়ে বলে, কিন্তু কী?

আপনি তো আপনার দেওরকে ভালই চেনেন। আপনি হয়তো বলতে পারবেন ওর ভাইটালিটি কিরকম।

মোটেই খুব বেশী নয়। রোগাই তো। তেমন কিছু শক্তিও নেই গায়ে। শক্ত কাজ করতে দিই না।

জিজার মুখে তবু প্রশ্ন ঝুলে থাকে। সে শ্রীময়ীর দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলে, আমার মনে হচ্ছে উনি খুব সহজে মরবেন না।

শ্রীময়ী উদ্ভাসিত মুখে বলে, মরবে না তো! উঃ, বাঁচালেন।

শ্রীময়ী ছুটে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো মাকালীর ছবিতে দুম করে মাথা ঠেকিয়ে আবার ফিরে এল। উজ্জ্বল মুখে বলল, কাল রাতে যখন ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই তো ও বলেছিল, আসব বউদি।

জিজা একটু অবাক হয়ে বলে, কী বলেছিল?

আসব বউদি। তখন কিন্তু ওর জ্ঞান নেই। একদম নেতিয়ে পড়েছে। কী করে যে সেই অবস্থায় ওকথা বলল তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না এতক্ষণ।

জিজার গায়ে সামান্য কাঁটা দিল।

শ্রীময়ী উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল জিজার মুখের দিকে। জিজ্ঞেস করল, ঠিক বলিনি? আমার মনে হচ্ছে, যতটা উত্তেজ ও হয়েছে বলে সবাই ভাবছে ততটা বোধহয় হয়নি। না?

জিজা ঘড়ি দেখল। প্রায় দুটো। সরোজ তাকে তিনটেয় যেতে বলেছে। কিংবা ঠিক বলেওনি। জিজা ওরকমই একটা শব্দ শুনেছে। সেটা ভুল শোনাও হতে পারে। সরোজের ওই তাকানো, ওই "তিনটেয়" বলা সবটাই হতে পারে ফ্যানটাসি।

॥ আট ॥

ফ্যানটাসি বোধহয় গোটা ব্যাপারটাই। ঘণ্টাখানেক আগে জিজা হাওড়ার পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রেস কনফারেন্সে বসেছে। হাওড়ার ব্যাপারটা তেমন গুরুতর নয় বলে সাংবাদিকদের সংখ্যা ছিল কম এবং তাদেরও বেশীর ভাগই জুনিয়র। হঠাৎ সেখানে টুলু চৌধুরীকে উপস্থিত দেখে ভারী অবাক লেগেছিল জিজার।

www.boiRboi.blogspot.com

আজ টুলু একটিও কথা বলছিল না তার সঙ্গে প্রথমে। এমন কি না দেখার অক্ষম ভান পর্যন্ত করেছে।

কিন্তু আজ টুলুকে লক্ষ্য করার দিন নয় জিজার। আজ এক অদ্ভুত রহস্যের উন্মোচনের জন্য সে অস্থির ছিল। বোধহয় সেই উত্তেজনাবশে আজ সে পুলিশের বড় কর্তাকে অনেকগুলো তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছে। আপনি কি উমাপতি চক্রবর্তী বলে কাউকে চেনেন?

পুলিশের বড়কর্তা অস্বস্তি বোধ করে বলেছেন, না। তিনি কে?

আপনার জানা উচিত ছিল। হি ওয়াজ এ ফ্রিডম ফাইটার।

সরি। জানতাম না।

পুলিশ আজকাল কোনও ইনফর্মেশনই রাখছে না। এটা দুঃখের ব্যাপার। উমাপতি চক্রবর্তীর রেফারেন্স দিচ্ছেন কেন?

কাল যে ছেলেটাকে কালুর দল মেরেছে সে উমাপতিবাবুর ছেলে।

মে বি। তাতে কী হল?

ছেলেটা অত্যন্ত শান্ত, ভীতু এবং নন পলিটিক্যাল।

মে বি!

পুলিশ এখন অবধি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। নো অ্যারেস্ট। ছেলেটা অত্যন্ত অযত্নে হাসপাতালে পড়ে শেষ সময়ের অপেক্ষা করছে।

এটা ট্রাইবলসাম এরিয়া। খুনখারাপী আমরা তো রাতারাতি বন্ধ করতে পারি না। কালুর দল মেরেছে না আর কোনও দল তা দেখতে হবে। অ্যারেস্ট করতে একটু সময় লাগবে।

বলতে বলতে বড়কর্তা পিছনে হেলে যুৎ করে বসে জিজার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় বললেন, সরোজ চক্রবর্তী ইনোসেন্ট কিনা সেটাও দেখতে হবে। বাদলের দলে স্বপন নামে একটি মস্তান আছে। রিয়্যাল বর্ণ কিলার। আপনি হয়তো খবর রাখেন না সরোজ তার গলায় গলায় বন্ধু।

জিজা একটু বিস্মিত হয়ে বলল, তাহলে খোঁজ রাখেন দেখছি।

একটু আধটু রাখতেই হয়। এর জন্যেই মাইনে পাই।

উপস্থিত সাংবাদিকরা একথায় চাপা হাসি হাসল। আর জিজা ক্ষেপে গেল। রীতিমত ঝাঁঝের গলায় সে বলল, সরোজের বিরুদ্ধে কোনও চার্জ আছে আপনার?

না। তবে স্বপন পরশুদিন রাতে পাণ্টুকে খুন করেছিল। পাণ্টু একসময়ে ছিল নাম করা বডি বিল্ডার।

তাতে কী হল? আপনি কি পাণ্টুর দলের লোক?

www.boiRboi.blogspot.com

বড়কর্তা মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললেন, না। যেমন আপনিও সরোজের দলের লোক নন। অন্তত হওয়া উচিত নয়। আপনি ওর আত্মীয় বা বন্ধু নন তো, মিস রায়?

জিজা বুঝতে পারছিল সে সরোজের হয়ে একটু বেশি লড়ে যাচ্ছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের ব্রিফিং নিতে এসে কোনও সাংবাদিকের এত উত্তেজিত হওয়া একটু অস্বাভাবিক। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না। আই মেট হিজ ফাদার অ্যান্ড আই ফেল্ট সরি।

বড়কর্তা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, জানি। আপনি উমাপতিবাবুকে একটা ডাবও খাইয়েছেন। এ গুড শো।

পুলিশ যে সব খবরই রাখে এ বিষয়ে জিজার আর সন্দেহ রইল না। একটু লজ্জা পেয়ে সে চুপ করে গেল।

রুটিন মাফিক পুলিশের তরফ থেকে একটা বিবৃতি দিলেন বড়কর্তা। সবই ছেঁদো বুলি। হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি।

জিজা শুনতে শুনতে হঠাৎ আবার ঝেঁঝে উঠতে যাচ্ছিল "অল বোগাস" বলে। সেই সময় পিছনে বসা টুলু চৌধুরি আচমকাই তার হাতটা ধরে চাপা স্বরে বলেছিল, জিজা, তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো? ইজ সামথিং রং?

জিজা হাতটা সরিয়ে নিয়ে চুপ মেরে গেল। খপ করে ওভাবে তার হাত ধরাটা সে পছন্দ করেনি মোটেই।

কিন্তু টুলু চৌধুরি নিজে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করল, হাওড়ায় ল' অ্যান্ড অর্ডার খুব খারাপ। ক'দিন আগেই হাসপাতালে একজন উণ্ডেড মস্তানকে তার অপোনেন্টরা ওয়ার্ডে ঢুকে খুন করে যায়। আমি জানতে চাই সরোজ চক্রবর্তীর প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আপনারা করেছেন কিনা।

বড় কর্তা মাথা নেড়ে বললেন, না। দু'জন প্লেন ড্রেস পুলিশ সকালে ছিল। কিন্তু ডাক্তাররা বলেছে সরোজ চক্রবর্তী ইজ বিয়ন্ড এভরিথিং। (ঘড়ি দেখে) মে বি হি ইজ ডেড বাই নাউ। সুতরাং—

জিজা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, মিথ্যে কথা! আটার লাই!

আবার টুলুর হাত তার হাত ধরল। চাপা গলায় টুলু বলল, প্লীজ জিজা, শান্ত হও। সরোজের অবস্থা যে খুব খারাপ তা সবাই জানে।

জিজা মুখ ফিরিয়ে টুলুর দিকে চেয়ে বলল, কিন্তু—

কথাটা অবশ্য শেষ করেনি জিজা। শুনিয়ে রেখেছিল। তার মনে হল সরোজ সম্পর্কে আর কিছু বলা তার উচিত হবে না।

ব্রিফিং শেষ হওয়ার পরই জিজাকে ধরেছিল শুভেন, স্পটগুলো দেখবেন

না ? চলুন।

আমার বাবাকে একটা ফোন করা দরকার। আজ বাবার সঙ্গে আমার লানচ খাওয়ার কথা ছিল, সেটা ক্যানসেল করতে হবে। নইলে বাবা বসে থাকবে আমার জন্য।

শুভেন তাকে ফোন করার ব্যবস্থা করে দিল।

শুভংকর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কী করছিস বল তো সকাল থেকে! কিছু খেয়েছিস ? এভাবে চললে তো অসুখ করবে।

না বাবা, খেয়েছি। দুপুরেও কোথাও খেয়ে নেবো। এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কেস চলছে।

কিসের কেস ?

পরে বলব, দেখা হলে।

আমার এসব মোটেই ভাল লাগছে না। রিপোর্টিং তো দেখছি এ ভেরি আনহেলদি জব।

না বাবা, ইট ইজ ভেরি হেলদি। শোনো, তুমি খেয়ে নাও।

কখন দেখা হবে তোর সঙ্গে ?

দেখি।

ডিনারে আসতে পারবি না ?

পারব বোধহয়।

বোধহয় কেন ?

অফিসে ফিরে রিপোর্ট লিখতে যদি রাত হয়ে যায় ?

কত রাত হবে ?

রাত ন'টা দশটা।

শুভংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী যে তোর হচ্ছে দিন দিন। আমি জামশেদপুর থেকে এলাম যার জন্য। সে-ই এখন কাজ দেখাচ্ছে। বাপের সঙ্গে বসে দুটি ভাত খাওয়ার সময় তার নেই। ডিসগাস্টিং।

বাবার অভিমান কি রকম তা জিজা জানে। হয়তো বাবার ওপর ভীষণ একটা অন্যায়ও করছে সে। কিন্তু এই একটু স্বাধীনতা না নিলেও যে নয়।

জিজা বলল, বাবা, রাগ করলে ? তোমাকে যখন গিয়ে সব বলব তখন রাগ জল হয়ে যাবে। ইট ইজ সো থ্রিলিং।

আচ্ছা, তাই হোক।

রাগ কোরো না।

করছি না। বাট টেক কেয়ার। বি ভেরি কেয়ারফুল। বলিস তো আমি চলে

আসতে পারি।

প্লীজ বাবা, ভেবো না। দেখা হবে।

শেষ অবধি অবশ্য জিজা দুপুরের খাবারটা খায়নি। সময় হল না। এখন এই বেলা আড়াইটেয় চনচনে খিদে পেয়েছে তার। কিন্তু সেটা উপেক্ষা করল জিজা।

শ্রীময়ীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন তাকে রাস্তায় নিয়ে এল। বলল, আরও কতগুলো স্পট দেখবেন ?

জিজা ঘড়ি দেখে বলল, না। আজ দেরী হয়ে যাবে। আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দেবেন ?

হ্যাঁ, অবশ্যই। একটা কথা জিজা, আমার নামটা ভুলে যাবেন না। শুভেন বসু।

জিজা করুণাভরে হেসে বলল, ভুলব না শুভেনবাবু। আপনার কথা রেফার করব। আপনি আমাকে অনেক হেল্প করেছেন।

বিগলিত শুভেন বলল, চিত্তদাকে আমার কথা বলবেন।

বলব।

ট্যাক্সি ধরে যখন জিজা হাসপাতালে পৌঁছোলো তখন প্রায় তিনটে। উমাপতিকে কোথাও দেখতে পেল না জিজা। ভীড় আর নেই। ভর দুপুরে হাসপাতালটা বেশ ফাঁকা।

জিজা বিনা দ্বিধায় করিডোর পেরিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকল এবং লম্বা পা ফেলে ফেলে হাজির হয়ে গেল সরোজের বেড-এর সামনে।

একইভাবে পড়ে আছে সরোজ। ডীপ কোমা। হাতে নল, মুখে নল। ব্যান্ডেজে ঢাকা মাথা।

জিজা ঘড়ি দেখল। তিনটে।

শুনছেন ?

সরোজ চোখ খুলল না। কিন্তু অত্যন্ত মৃদু এবং স্পষ্ট স্বরে বলল, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখটা আড়াল করুন। উল্টো দিকের তিন নম্বর বেড থেকে একজন আমাকে লক্ষ্য করছে।

জিজা সরোজকে এত দীর্ঘ বাক্য উচ্চারণ করতে শুনে শিউরে উঠল। ব্যাপারটা ভুতুড়ে নয় তো ? তবু সে সরোজের নির্দেশমতো মুখটা আড়াল দিয়ে দাঁড়াল।

সরোজ তেমনি শুয়ে থেকে বলল, দেয়ালের গায়ে একটা ভাঁজ করা পর্দার স্ট্যান্ড আছে দেখুন। কেউ মরলে ওটা দিয়ে বেডটা ঘিরে দেওয়া হয়। তিন

www.boiRboi.blogspot.com

নম্বর বেড-এর লোকটা আর এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। তখন ওই পর্দাটা দিয়ে আমার বেডটা ঘিরে দেবেন।

কেন ?

আমি চলে যাবো।

পারবেন ?

একা পারব না। আপনি হেলপ করলে পারব।

কোথায় যাবেন ?

অনেক কাজ বাকী।

কি কাজ ?

আপনি তা দেখতেই পাবেন।

কিন্তু—

সময় হয়ে গেছে। পর্দাটা টেনে দিন।

কিন্তু কেউ দেখে ফেললে ?

কেউ দেখলেও ক্ষতি নেই। সবাই জানে আমি মরে যাচ্ছি। পর্দাটা আমার জন্যই এনে রাখা হয়েছে। আপনি ওটা টেনে দিন।

জিজা চারদিক দেখে নিল একটু। কেউ কোথাও নেই। রুগীরা ঘুমোচ্ছে। কাতরাচ্ছে। নিজের সমস্যায় ডুবে আছে সবাই।

জিজা স্ট্যাণ্ডটা টেনে আনল। ঘিরে দিল বেড। তারপর অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে দেখল, হাত আর মুখের নল খুলে ফেলল সরোজ। তারপর ধীরে উঠে বসল। যেন মিশরের মমী উঠে বসছে, এরকম এক ভয়াল দৃশ্য দেখার আতঙ্ক নিয়ে চেয়ে রইল জিজা।

সরোজ খুব স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ায় নামল এবং সহজভাবে দাঁড়াল। জিজার দিকে চেয়ে বলল, সব ঠিক আছে। কোনওদিকে না তাকিয়ে এগোন। আমি পিছনে আসছি।

জিজা ভয়ে সিঁটিয়ে এবং ভীষণ কাঁপা বুক নিয়ে যথাসম্ভব স্মার্টনেস বজায় রেখে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল। সরোজের শ্বাস তার গায়ে পড়ছিল পিছন থেকে।

জিজা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই সরোজ বলল, ওদিকে নয়। ডানধারে চলুন। ফটকের কাছে আমার দুজন চেনা লোক। ওরা দেখে ফেলবে।

জিজা বাধ্য মেয়ের মতো বাঁ ধারে এগোলো।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফটকের ওপাশে অপেক্ষা করুন। আমি দু মিনিটের মধ্যে আসছি।

www.boiRboi.blogspot.com

কী হচ্ছে তা জিজা বুঝতে পারছে না। কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘ্য এক নিয়মে সে আদেশ পালন করছে মাত্র। বাইরে বেরিয়েই জিজা ট্যাক্সি পেল না। একটু উজিয়ে গিয়ে ময়দানের দিক থেকে ধরে আনতে হল। যখন ফটকের কাছে এসে থামল জিজা তখন সেখানে বেশ একটা হল্লা এবং ভীড়। এর মধ্যেই কী ঘটল আবার ? জিজা গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল। ড্রাইভারও "আসছি" বলে নেমে গেল ঘটনাটা দেখতে।

হঠাৎ অন্যধারের দরজাটা খুলে কে যেন উঠে পাশে বসল।

চমকে ফিরে তাকাল জিজা। সরোজ। পিছনে হেলে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ক্লান্ত স্বরে বলল, আঃ।

জিজা শুকনো মুখে বলল, ওখানে কী হয়েছে বলুন তো।

তার ঠোঁট ফাটা, দাঁত ভাঙা, গালে কালশিটে। সরোজ মুখটা একটু বিকৃত করল। তারপর বলল, দুটো লোকের কথা বলেছিলাম, মনে আছে ?

হ্যাঁ। আপনার চেনা লোক।

চেনা এবং শত্রুপক্ষের।

লোকদুটোর কী হল ?

মরে গেছে।

কে মারল ?

সরোজ মাথাটা একটু নাড়ল। ডাইনে বাঁয়ে ; তারপর তিক্ত কণ্ঠে বলল, জানি না তো। তবে ওদের মরাই উচিত।

তার মানে ?

সবটুকু মানে এখনও আমি জানি না। তবে হঠাৎ পড়ে মরে গেল।

ইমপসিবল। কী যা তা বলছেন ?

সরোজ করুণ মুখ করে বলল, ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত ঠিকই। কিন্তু কী যে হল তা আমিও বুঝতে পারছি না। ওরা হল রামু আর হরিয়া। কালুর দলের ছেলে। কাল আমাকে যারা মারতে এসেছিল তাদের মধ্যে ওরাও ছিল।

জিজা একটু শিউরে উঠে বলল, তারপর ?

আমি বেঁচে আছি জেনেই বোধহয় ওই দুজনকে হাসপাতালে খবর নিতে পাঠানো হয়েছিল।

কী করে বুঝলেন ?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, সঠিক জানি না। তবে মনে হয়েছিল। আমাকে জ্যান্ত দেখলে হাসপাতালের বিছানাতেই ওরা আমাকে মেরে রেখে যেত। এরকম আগেও হয়েছে এখানে।

জিজা একটা কম্পিত শ্বাস ফেলে বলল, জানি। কিন্তু আপনার ওপর ওদের এত রাগ কেন ?

কি জানি ! কাল তো স্বপনের ওপর বদলা নিতে আমাকে শেষ করে দিয়ে গেল। আজ আবার অ্যাটেম্পট করাটা অস্বাভাবিক। তবে আমার মনে হয় কারণটা আপনি।

বিস্মিত জিজা বলল, আমি ?

আপনি আমার ব্যাপারে একটু বিশেষ ইন্টারেস্ট দেখিয়েছেন। আপনি খবরের কাগজের লোক, ইনফ্লুয়েনশিয়াল। কোনও সূত্রে ওরা খবরটা পেয়ে শত্রুর শেষ না রাখতে এসেছিল।

কিন্তু মরল কিভাবে ?

সরোজ ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, সত্যিই জানি না। ওদের দেখলাম গেট দিয়ে ঢুকছে। হঠাৎ চোখাচোখি হতেই ওরা এমনভাবে তাকাল যেন ভূত দেখছে। রামুর কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ ছিল। টক করে ও সেটার মধ্যে হাত ভরল। আমার এত ঘেন্না হচ্ছিল ওদের দেখে।

তারপর কী হল ?

কি জানি কী হল। হঠাৎ দুজনেই দেখি উপুর হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। লোকজন দৌড়ে এল। চিৎকার চেঁচামেচি। কে একজন বলল, দুটোই মরে গেছে।

জিজা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। বুকটা ধড়ধড় করে কাঁপছে। সেই কাঁপন তার গলাতেও উঠে এল, কেউ পিছন থেকে ওদের গুলি টুলি করেনি তো ?

সরোজ মাথা নাড়ল, না বোধহয়। তবে—

তবে কি ?

আচ্ছা, ওদের তো হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে !

বিস্মিত জিজা চোখ কপালে তুলে বলল, দুজনের একসঙ্গে ? তাই কখনও হয় ?

সরোজ চুপ করে চেয়ে রইল সামনের দিকে। তারপর মাথা নেড়ে আপনমনে বলল, আমি জানি না। আমি বুঝতে পারছি না।

কী বুঝতে পারছেন না ?

সরোজ জিজার দিকে সোজাসুজি তাকাল। দুই চোখে এক অদ্ভুত তীব্রতা। কারো চোখের দৃষ্টি যে এরকম তীব্র হতে পারে তা ধারণায় ছিল না জিজার। সে একটা তাপ টের পাচ্ছিল ওই চোখের দৃষ্টিতে। সরোজ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জিজার একখানা হাত ধরে ফেলে ফিসফিস করে বলল, তাহলে কি আমিই

www.boiRboi.blogspot.com

দায়ী ?

জিজা হাত ছাড়িয়ে নিল না। একটা শুকনো ঢোঁক গিলে বলল, আপনি দায়ী হবেন কেন ? আপনি তো কিছু করেননি ?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, না, আমি কিছু করিনি ঠিকই। তবে ওদের দেখে আমার ভীষণ ঘেন্না হয়েছিল। রামু যখন ব্যাগে হাত ভরেছিল তখনও ভয়ের বদলে আমার শুধু ঘেন্না হচ্ছিল। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম এক দৃষ্টে। হঠাৎ কী হল জানেন ?

জিজা অস্ফুট গলায় বলল, কী ?

আমার শরীরের ভিতরে যেন একটা ঝাঁকুনি দিল। আর একটা ইলেকট্রিক চার্জের মতো কিছু একটা আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপরেই কি—

সরোজ মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তারপরই ওই দুজন একসঙ্গে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গল মাটিতে।

মাই গুডনেস !

সরোজ জিজার হাতটা আরও শক্ত করে চেপে ধরে বলল, কী হয়েছে আমার বলুন তো !

জিজার ভারী করুণা হল এই যুবকটির ওপর। বিস্ময়ও সে বোধ করছে বটে, কিন্তু এই মার-খাওয়া দুর্বল ছেলেটির প্রতি তার মায়া হচ্ছে। জিজা নির্দ্বিধায় সরোজের কাছ ঘেঁষে বসে ওর মাথাটা সিটে হেলিয়ে দিয়ে বলল, একটু রেস্ট নিন। আপনি যে সিরিয়াসলি উণ্ডেড তা কি আপনি জানেন ?

সরোজ মৃদু একটু হাসল। বলল, জানব না কেন ? আমি কিছুই ভুলিনি।

তবু যে কী করে আপনি এখনও—

সরোজ একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, কে জানে কি হচ্ছে। তবে একটা অদ্ভুত কিছু হচ্ছে আমার ভিতর। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কি আমাকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাবেন ?

জিজা মাথা নেড়ে বলল, না। আমি আপনাকে বোঝবার চেষ্টা করছি।

বাঁচালেন। আপনি কাল আমাকে দেখতে এলেন তখন আমি একটা ভারী সুন্দর গন্ধ পেয়েছিলাম। মিষ্টি নরম একটা গন্ধ। কেন যেন মনে হল, এই গন্ধ যার গা থেকে আসছে সে আমাকে সাহায্য করবে।

কিন্তু আপনি তো কোমার মধ্যে ছিলেন !

ঠোঁট উল্টে সরোজ বলল, কে জানে ! কোমা কেমন আমি তো জানি না। তবে ভিতরে ভিতরে আমি কাল থেকেই একটা অস্থিরতা টের পাচ্ছি। মাঝে

মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম ঠিকই, কিন্তু অজ্ঞান হইনি তো।

তাহলে চোখ বুজে ছিলেন কেন ?

মনে হচ্ছিল চোখ বুজে থাকলেই আমি নিরাপদ। ডাক্তার নার্স আমাকে খোঁচাখুঁচি কম করেনি। তারাও বলাবলি করছিল, আমি লস্ট কেস। কিন্তু আমার তো তেমন কিছু মনে হচ্ছিল না। আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম, দেখতে পাচ্ছিলাম। বরং একটু বেশিই পাচ্ছিলাম।

সেটা কিরকম ?

ঠিক বোঝাতে পারব না। আমি এমন অনেক কিছু টের পাচ্ছি যা এমনিতে পেতাম না।

জিজা হঠাৎ সতর্কভাবে চারদিকে চাইল। তারপর ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে হর্নের রিংটায় চাপ দিল।

সরোজ বলল, কি করছেন ?

আপনাকে এখান থেকে চটপট সরিয়ে নিতে হবে। কেউ দেখে ফেললে মুস্কিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার ওই দুটো লোককে দেখতে গেছে। তাকে ডাকছি।

সরোজ বুঝল। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমার সরে যাওয়াই দরকার।

ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে তাড়াতাড়ি সিটে বসে স্টার্ট দিতে দিতে বলল, দুজন লোক একসঙ্গে স্ট্রোক হয়ে মরে গেল।

জিজা অবাক হয়ে বলল, স্ট্রোক ! কে বলল স্ট্রোক ?

একজন ডাক্তার এসে দেখল যে। বলল, এরকম দেখা যায় না। দুজনের একসঙ্গে স্ট্রোক। বয়সও বেশি নয়। পঁচিশ ছাব্বিশ। কোথায় যাবে দিদি ?

জিজা সরোজের দিকে তাকাল। সরোজ নির্বাক হয়ে পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে।

জিজা সরোজের হাতে কোমল একটু চাপ দিয়ে বলল, বেহালায় আমাদের একটা মেস আছে, চারজন থাকি। সেখানে যাবেন ?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, না।

তাহলে।

আমার কেবল আমাদের বাড়ির সামনেকার বন্ধ কারখানাটার কথা মনে হচ্ছে।

সেখানে গিয়ে কী হবে ?

ঠোঁট উল্টে সরোজ বলল, কি জানি। তবে মনে যখন হচ্ছে তখন ওখানেই যাওয়া ভাল।

ফলোয়িং ইওর ইনস্টিংট ?

বোধহয় সেটাই ভাল হবে।

বেশ, তবে তাই হোক।

সরোজ চোখ বুজেই ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিয়ে যেতে লাগল। গাড়ি নানা পথে ঘুরে একটা নির্জন গলিতে এসে থামল। এটা সরোজদের গলি নয়। কারখানার পশ্চিম ধার। ডানদিকে কারখানার দেওয়াল, বাঁয়ে খাটাল।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল জিজা।

এবার কী করবেন ?

সরোজ নিরুদ্বেগ মুখে জিজার দিকে চেয়ে বলল, ঢুকব।

কোথা দিয়ে ?

আসুন, দেখাচ্ছি।

একটু হাঁটতেই কারখানাটার মস্ত একটা গেট। লোহার নিপাট বড় দরজা। বোঝা যায়, এই পথে লরি বা ট্রাক ঢোকে। এখন তালাবন্ধ, অনড়। দরজার ডানধারে তলার দিকে ছোট্ট একটা চৌখুপী। সেটাও বন্ধ। সরোজ নিচু হয়ে চৌখুপীটায় হাত দিয়ে একটু নাড়া দিল। ধীরে খুলে গেল কপাট।

কোলকুঁজো হয়ে দুজনেই ভিতরে ঢুকল। সরোজ কপাট বন্ধ করে একটা হুড়কো টেনে দিল।

জিজা চারদিকে চেয়ে এক করুণ দৃশ্য দেখল। বিশাল এক কারখানা তার যন্ত্রপাতি সমেত জঙ্গলে ডুবে যাচ্ছে। কলকব্জায় জং ধরেছে, টিনের শেডে ফুটো, চিমনি ভেঙে পড়ে গেছে আধখানা।

এটা কিসের কারখানা ?

সরোজ বলল, স্টিলের। হাই কোয়ালিটি স্টিল। বহুকাল বন্ধ হয়ে গেছে।

এইখানেই কি আপনাকে— ?

হ্যাঁ। ওই যে ওখানে।

সরোজ জায়গাটা দেখিয়ে দিল। পিছনে একটু ফাঁকা মতো জমি। জিজা এগিয়ে গিয়ে দেখল, এখনো ঘাসে কালচে রক্তের ছোপ। মাছি উড়ছে। একটু শিউরে উঠল সে।

খুব লেগেছিল আপনার ?

সরোজ চোখ বুজল। শরীরে একটা ঝাঁকনি দিল তার। একটুক্ষণ দম ধরে থেকে সে খুব ধীর স্বরে বলল, জীবনে আমি মার প্রায় খাই-ইনি। বাবা মারতেন না, মাও না। স্কুলে ছিলাম শান্ত বালক।

এদের মার কি করে সহ্য করলেন ?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, সহ্য করিনি। আমি খুব সহনপটু নই। তবে

www.boiRboi.blogspot.com

মারের চেয়েও অনেক বেশি যেটা বোধ করেছিলাম সেটা কী জানেন ?

কি ?

অপমান। আমার মা বাবা বউদির সামনে আমারই বাসার ভিতর থেকে টেনে এনে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে, যেন আমি কুকুর। সেই অপমানেই আমি ভীষণ ছটফট করেছিলাম তখন।

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার শরীরে কোনও ব্যথা নেই।

সরোজ মৃদু একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলল, শরীর অনেকক্ষণ হল ঝিম মেরে আছে। কেমন যেন অসাড় একটা ভাব। না, আমি কোনও ব্যথা বোধ করছি না।

আশ্চর্য !

হ্যাঁ। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

খিদে তেষ্টার বোধ ?

হ্যাঁ, আমর ভীষণ খিদে পেয়েছে। তেষ্টাও।

কী করব বলুন তো ? আপনার বাড়ি তো কাছেই, কিছু নিয়ে আসব ?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, ওরা টের পাক আমি চাই না।

আপনি যে বেঁচে আছেন সেটা ওদের জানাবেন না ?

সরোজ ফের মাথা নাড়ল, না।

কেন ?

সরোজ একটু ভেবে নিয়ে বলল, হাসপাতালে থাকতে ভেবেছিলাম বাড়ি চলে আসব। বাবার কাছে, মা আর বউদির কাছে ফিরে আসব। কিন্তু এখন ভাবছি ওরকম করাটা ঠিক হবে না।

কেন ?

বুঝতে পারছি না। আমার মন বলছে আবার ঘরে ফিরে আসার জন্য আমি মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসিনি। আমার বোধহয় অন্যরকম কিছু কাজ আছে।

কি কাজ ?

তা এখনও সঠিক জানি না। আস্তে আস্তে মাথায় আসবে। আর—

আর কী ?

সরোজ মাথা নেড়ে বলল, আমি এখন বোধ হয় খুব বিপজ্জনক লোক।

জিজা এ কথায় আবার শিউরে উঠল। কিন্তু কেন যেন সরোজকে তার ভয় হল না। মায়া হল। বড় মায়া হল। আহা, কী মারটাই মেরেছে.ওকে গুণ্ডারা ! ফাটা ঠোঁট, ভাঙা দাঁত, রক্ত জমাট বেঁধে আছে মুখের এখানে-সেখানে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। গায়ের জামাটা এখনও ছেঁড়া। ফাঁক দিয়ে বুকের ব্যাণ্ডেজ দেখা

যাচ্ছে। রোগা, সুকুমার চেহারার এই কোমল ছেলেটিকে কি অত মারে ?

জিজা সরোজের হাত ধরে একটা কংক্রিট স্ল্যাবের ওপর বসাল। নিজে তার পাশে বসে বলল, কেন এত ভয় পাচ্ছেন ? হাসপাতালে যে গুণ্ডাদুটো মরে গেল তাদের স্ট্রোক হতেও পারে।

সরোজ জিজার দিকে অকপটে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেলে বলল, তাই যদি হত !

জিজা সরোজের কাঁধে হাত রেখে বলল, আপনার খিদে পেয়েছে। একটু অপেক্ষা করতে পারবেন একা একা ? আমি একটু আসছি।

সরোজ সভয়ে তাকায় জিজার দিকে। রীতিমত উদ্বেগের গলায় বলে, যদি ফিরে আসতে না পারো ?

সরোজের মুখে তুমি শুনে জিজা একটু হাসল। বলল, না এসে উপায় আছে ?

তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ না তো ? ভয় পেও না।

জিজা আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু শিউরে উঠল। চোখ বুজে শিউরানিটা কাটিয়ে সে বলল, একজনকে তো খেতেও হবে। আপনি অনেকক্ষণ কিছু খাননি। শুধু ড্রিপের ওপর ছিলেন।

॥ নয় ॥

উমাপতি অনেকক্ষণ হাসপাতালের চত্বরে অর্থহীন চক্কর দিয়েছেন। ঠিক যেমন গুবরে পোকা ঘরে ঢুকে চক্কর দেয় আর দেয়ালে দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে বারবার পড়ে যায়, তাঁর হয়েছে সেই দশা। কখনও ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ছেন, কখনও আউটডোরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভিতরের অস্থিরতাটা একটু পরেই পুত্রশোক হয়ে ফেটে বেরোবে। যখনই সরোজের কথা মনে পড়ছে তখনই যেন নিবে যাচ্ছে ভিতরটা। দুটো লোককে মেরেছিলেন কতকাল আগে। সব চুকেবুকে গিয়েছিল। স্বদেশী আমলের সেই কীর্তি এতকাল খানিকটা গৌরবের সঙ্গেই স্মরণ করেছেন। কিন্তু কর্মফল কি ঠিক ওরকমভাবে ফলে না ? কর্মফল কি তবে অপেক্ষা করে এবং শোধ না তুলেই ছাড়ে না ?

তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে দুটো ছেলে এসেছিল। তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই শেষ সময়টুকু তিনি সরোজকে ছেড়ে যাবেন না।

ফটকের দিকটায় বেশ ভিড় দেখে এগোলেন উমাপতি। খুব হৈ-চৈ হচ্ছে।

উমাপতি ভিড় ঠেলে এগিয়ে দেখলেন দুটো লোক পড়ে আছে। একজন ডাক্তার-গোছের লোক হাঁটু গেড়ে বসে পালস্ দেখছে। উমাপতি পিছিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

এলেন। হাঁটতে হাঁটতে অন্য ধারে চলে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন তা বুঝতে পারছেন না। ঠিক গুবরে পোকার মতো অবস্থা।

মেসোমশাই!

উমাপতি ফিরে চাইলেন। ছায়া। তারই পাড়ার মেয়ে, হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে। মেয়েটার মুখটা কেমন যেন ভয়-খাওয়া, অপ্রস্তুত।

মেসোমশাই, সরোজ—মানে সরোজকে কি বেড থেকে রিমুভ করা হয়েছে?

উমাপতি খুব অবাক হয়ে বললেন, আমি তো জানি না। সে তো তোমরা জানবে।

মেয়েটা ঠোঁট কামড়াল। তারপর চিন্তিতভাবে বলল, আমি চল্লিশ মিনিট আগেও ওকে দেখেছি। বেড-এ ছিল। কিন্তু এখন দেখছি না। বেডটা পর্দা দিয়ে ঢাকা।

বলো কী? উমাপতি চমকে উঠলেন।

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু বেড-এ তো সরোজ নেই। কে ওকে রিমুভ করবে?

উমাপতির শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। মাথাটা পাক দিচ্ছে। হাঁফ-ধরা গলায় বললেন, ম-মরে গেছে? ডেডবডি—

ছায়া মাথা সজোরে ডাইনে-বাঁয়ে নেড়ে বলল, অসম্ভব। মরে গেলে তো আমি প্রথম জানব। ডিউটিতে তো আমি আছি। আমাকে না বলে কে রিমুভ করবে?

উমাপতি কথা বলতে পারছিলেন না। শুধু চেয়ে রইলেন।

ছায়া চকিত পায়ে চলে গেল।

উমাপতি মাঠের মধ্যেই বসে পড়লেন। কতক্ষণ বসে ছিলেন তা তাঁর হিসেবে নেই। তবে অনেকক্ষণই হবে। তাঁর মাথা পাক খাচ্ছিল। শরীর ঝিমঝিম করছিল।

ছায়া ঘুরে এল অনেকক্ষণ বাদে। মাথা নেড়ে বলল, খুব স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার। সরোজকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু একটা বাচ্চা ছেলে বলল, একটা মেয়ের সঙ্গে মাথায় ব্যাণ্ডেজবাঁধা একজন লোককে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

মেয়ে! কে মেয়ে?

যা শুনলাম তাতে মনে হল সেই রিপোর্টার মেয়েটা।

সরোজ! সরোজের কি হাঁটার ক্ষমতা আছে?

অসম্ভব। সরোজের জ্ঞানই তো ছিল না। ডীপ কোমা।

তাহলে?

www.boiRboi.blogspot.com

ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু সরোজ কোথায় যাবে?

উমাপতি উঠে দাঁড়ালেন। শরীরটা আপাদমস্তক থর থর করে কাঁপছে, হাঁফ-ধরা গলায় বললেন, কী হল তাহলে, ছায়া? আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না।

অত ঘাবড়ে যাবেন না। আমি দেখছি।

দেখল সকলেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাসপাতালে ছোটখাটো একটা সোরগোল পড়ে গেল। ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয় উদ্বিগ্ন, প্রশ্নাতুর। এল পুলিশও। কিন্তু কোনও হদিশই পাওয়া গেল না সরোজের।

কথাটা শহরের দিকে ছড়িয়ে পড়তেও দেরী হল না।

উমাপতি অনেকক্ষণ বসে ছিলেন হাসপাতালের বারান্দায়। মাথায় হাত। এক সময়ে বুঝলেন তাঁর আর অপেক্ষা করা বৃথা। কোনও অলৌকিক কাণ্ড তিনি বিশ্বাস করেন না ঠিকই। কিন্তু যুক্তি বা লজিক এখন কাজ করছে না। তাঁর ভাবতে ইচ্ছে করছে, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর সেই ঘটনার মতো সরোজেরও মৃতদেহ যদি কোনও সাধুসন্ত বা সন্ন্যাসী এসে নিয়ে গিয়ে থাকে? তারা হয়তো সরোজকে বাঁচিয়ে তুলবে। মন্ত্রতন্ত্রের কত ক্ষমতা কে জানে। হয়তো তারা পারবে। সরোজ যদি সাধু হয়েও বেঁচে থাকে তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। বেঁচে থাকলেই হল। শেষ বয়সে তাহলে উমাপতিকে এত বড় দাগাটা পেতে হয় না।

যখন রওনা হচ্ছেন উমাপতি, তখনই ছায়া আবার এল।

মেসোমশাই, খুব অদ্ভুত ব্যাপার। আরও কয়েকজন বলছে যে তারা সরোজকে সেই মেয়েটির সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। একজন ডাবওয়ালা দেখেছে, ঝাড়ুদার দুখিয়া দেখেছে, দুজন আয়া দেখেছে।

সরোজ? ঠিক জানো যে সে সরোজ?

সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। সরোজ কি করে হাঁটবে? তার তো বাঁচারই কথা নয়। আপনি বাড়ি যান মেসোমশাই।

উমাপতি খুবই উত্তেজিত বোধ করতে লাগলেন। সরোজ! সরোজ হেঁটে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেছে! ওঃ ভগবান!

কিভাবে যে বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছোলেন উমাপতি তা তিনি নিজেও জানেন না। বাসে এলেন? নাকি হেঁটে? নিজে এলেন? নাকি কেউ পৌঁছে দিয়ে গেল? কিছু মনে পড়ল না।

বউমা! বউমা! শুনেছো খবরটা? দরজা খোলো শিগগীর।

★ ★ ★

খবরটা অনেক জায়গাতেই পৌঁছে গেল বিদ্যুৎগতিতে। খবর পেল পুলিশ।

খবর পেল শুভেন। খবর পেল কালু। খবর পেল পাবলিক। শুরু হল প্রকাশ্য এবং গোপন দুরকম অনুসন্ধান।

বিকেলে খানিকটা খাবার কিনে নিয়ে গিয়েছিল জিজা একটা দোকান থেকে। দোকানদার তাকে মনে রেখেছিল। জিনস আর কামিজ-পরা তীক্ষ্ণ চেহারার কোনও মেয়ে তো তার দোকানে বড় একটা আসে না। জিজা যখন খাবার নিয়ে চলে গেল তখন 'দোকানদারের চোখ তাকে অনুসরণ করল বহু দূর অবধি। দেখে নিল জিজা কোনদিকে যায়। মেয়েটাকে সে আরও একবার দেখেছে দুপুরে, শুভেনের সঙ্গে। এ পাড়ায় কেন যে ঘুরঘুর করছে।

দোকানদারের মুখ থেকে কথাটা পাঁচকান হল।

সন্ধের একটু পর জিজাকে আর একবার বেরোতে হল টেলিফোন করতে। তার বাবা তার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। কোথা থেকে টেলিফোন করতে হবে তা বলে দিয়েছিল সরোজ।

শ্রীকৃষ্ণ মেডিকেল স্টোর্স থেকে যখন সে ফোনে বাবাকে পেল তখনও শুভঙ্করের দুশ্চিন্তা শুরু হয়নি। স্বাভাবিক গলাতেই বলল, আর কতক্ষণ লাগবে তোর ?

জিজা মৃদু স্বরে বলল, একটু আটকা পড়েছি বাবা, আজ বোধ হয় ডিনারেও আসতে পারছি না।

শুভঙ্কর ফেটে পড়ল ফোনে, তার মানে ? এ সব কী হচ্ছে আমি জানতে চাই ! তুই আজই রেজিগনেশন দে, এক্ষুনি—

মোলায়েম গলায় জিজা বলল, শোনো বাবা, আমি চাকরিতে আটকে পড়িনি, আমি একটা অদ্ভুত সিচুয়েশনে পড়েছি।

আর ইউ ইন এনি ডেনজার ?

না, না। আমার কোনও বিপদ নেই। কিন্তু বিপন্ন একটি লোককে শেলটার দিতে হচ্ছে।

শেলটার ! হোয়াট ড় ইউ মিন ? তুই শেলটার দিবি কেন ?

আমি শেলটার না দিলে লোকটা মারা পড়বে।

তার মানে ইউ আর ইন রিয়্যাল ডেনজার।

তোমাকে ফোনে সব বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আগে বল তুই কোথা থেকে কথা বলছিস।

হাওড়া।

অ্যাড্রেস দে।

অ্যাড্রেস কিছু নেই। মুভিং অল দি টাইম।

আমি এই সব রহস্যের মানেই বুঝতে পারছি না জিজা ! তুই কাকে শেলটার দিচ্ছিস ? ইজ হি অ্যান অ্যান্টিসোস্যাল ?

না বাবা। পরে বলব।

তুই লোকটাকে নিয়ে আমার হোটেলে চলে আসছিস না কেন ? শেলটার দেওয়া কি মেয়েদের কাজ ? দরকার হলে আমি শেলটার দেবো।

আচ্ছা, ওকে বলে দেখি। যদি রাজি হয় তো নিয়ে যাব।

দরকার হলে বল আমি গিয়ে নিয়ে আসছি তোদের।

না। তুমি ভেবো না বাবা।

বাবা হয়ে যে কী ভুলই করেছি !

জিজার একটু কষ্ট হল বাবার জন্য। বেচারা। ফোন রেখে সে বেরিয়ে এল বাইরে। কিন্তু তার অলক্ষে দুটি ছেলে দোকানের বাইরে অপেক্ষা করছিল। একজন তার পিছু নিল, অন্যজন দৌড়ে একটা গলিতে গিয়ে ঢুকল।

একটু ঘুরপথে কারখানার পিছনের গলিপথে ঢুকল জিজা। জায়গাটা অন্ধকার, নির্জন, গা-ছমছমে। তবু লোকচক্ষুর আড়ালে বলে এই পথটাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সরোজ কেন কারখানাটা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইছে না তা বুঝতে পারছে না জিজা। কিন্তু ওকে বোঝানো দরকার। এই জায়গাটা মোটেই ওর পক্ষে নিরাপদ নয়।

জিজা গলিটার মাঝামাঝি চলে এল নিরাপদে। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিল পেছনটা। কেউ নেই।

কিন্তু আচমকা ঘটনাটা ঘটল। ভীষণ আচমকা, অপ্রত্যাশিত।

একটা ধাঁধাঁলো টর্চের আলো এসে পড়ল জিজার মুখে। অন্ধকার ফুঁড়ে দু তিনটে কালো কালো মূর্তি জেগে উঠল। জিজা কিছু বুঝবার আগেই অপ্রস্তুত গালে একখানা চড় এসে পড়ল ঠাস করে। জিজার মাথা ঘুরে গেল, চোখে অন্ধকার।

এই শালী শুয়োরের বাচ্চি ! এই শালী খানকি, ওঠ !

একটা হ্যাঁচকা টানে জিজাকে দাঁড় করাল একটা রগ-ওঠা কেটোহাত।

কোথায় তোর নাঙ ? বল শালী, নইলে জবান খিচে নেবো হারামজাদী।

জিজার ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তাকে জীবনে কেউ কখনও মারেনি।

কে যেন তার চুলের মুটি ধরে এমন নির্মমভাবে মুড়িয়ে দিল যে পটপট করে অনেকগুলো চুল ছিঁড়ে গেল গোড়া থেকে। ঘাড়টা লটকে গেল ডানদিকে। সেই সঙ্গে একটা লাথি এসে লাগল হাঁটুতে। পড়ে গেল জিজা। কিন্তু পুরোটা

www.boiRboi.blogspot.com

নয়। যে চুল ধরেছিল সে ছাড়েনি বলে ঝুলে রইল সে।

শালা শুয়োরের বাচ্চা সরোজ চক্রবর্তীকে হাসপাতাল থেকে তুলে এনেছে আমাদের ঝোলাবে বলে। এক লাথিতে পেট খসিয়ে দেবো মাগী! বল কোথায় সেই খানকির বাচ্চা?

কিন্তু জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা জিজার নয়। সে শুধু কাতর একটা বোবা আওয়াজ করল।

কে তার কামিজ ছিঁড়ে বুকে হাত দিচ্ছে। ব্রাটা পটাং করে খুলে ফেলল এক টানে। একটা লোহার মতো হাত চেপে ধরল ডানদিকের স্তন।

জিজার নিজের শরীরের শুধু অসহায় এক কাঁপুনি টের পাচ্ছে।

একজন বলল, রেপ কর। রেপ করে ডোবায় চুবিয়ে দে।

রেপ! হা ভগবান! জিজার যে কেন এখনও জ্ঞান আছে! কামিজটা তার গা থেকে খুলে নিল কে! জিনসের প্যান্ট ধরে নির্মম টান দিচ্ছে!

★ ★ ★

নিঝুম অন্ধকারে ভুতুড়ে কারখানার চাতালে ঝিম মেরে বসে ছিল সরোজ। একটু তন্দ্রার মতো ভাব। শরীর অবশ।

মাথার ওপর এক ঘোলাটে আকাশ থেকে হিম নামছে। বড় অদ্ভুত লাগছে তার। সে যেন আর সে নয়।

সরোজ বুঝতে পারছে সে সরোজ চক্রবর্তী, উমাপতি চক্রবর্তীর ছোট্ট ভীতু ছেলে। কিন্তু তবু সে আর হুবহু সেই সরোজ নয়। নিজেকে তার ভারী রহস্যময় অচেনা এক মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এই যে একা সে বসে আছে নির্জনে, তার মনে হচ্ছে সে বসে আছে একই দেহে অন্য আর একজনের পাশাপাশি। পাশের লোকটাও সরোজ। কিন্তু অন্যরকম সরোজ।

দেয়ালের ওপাশে একটু দূরে একটা চেঁচামেচির মতো শুনল সরোজ। তর্জনগর্জন। সে মুখ তুলল। শরীরে একটা অস্থিরতা আর জ্বালা দেখা দিল হঠাৎ।

সরোজ উঠল। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে কারখানার ফটকের গায়ের ফোকরটা খুলে বেরিয়ে এল। জিজা অনেকক্ষণ ফিরছে না। একটা টেলিফোন করতে এতক্ষণ সময় লাগার কথা নয়।

বাঁ দিকে একটু দূরে অন্ধকারে একটা টর্চের আলো দেখতে পেল সরোজ। কয়েকটা ছেলে। একটা হুটোপাটি। তারই মধ্যে টর্চের আলোয় একটা গোলাপী কামিজ হাওয়ায় দুলে উঠল।

সরোজের শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগল হঠাৎ। সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, জিজা! জিজা!

টর্চটা থমকাল। চোখের পলকে ঘুরে এল সরোজের দিকে।

সরোজ হতভম্বের মতো চেয়ে রইল। কারা এরা? জিজাকে এরা কী করছিল?

কী একটা উড়ে এল অন্ধকারে! সরোজ বুঝল না, কিন্তু তার মাথাটা নীচু হয়ে গেল আপনা থেকেই।

বোমাটা বিকট একটা শব্দে পিছনে অনেকটা দূরে পড়ে ফাটল।

সরোজ সোজা হয়ে দাঁড়াল। না, সে নড়ল না, পালাল না। তার সমস্ত শরীরটা ভরে উঠল ঘৃণায়। তীব্র অসহনীয় ঘৃণা। ভিতরে সেই দুরন্ত জ্বালার মতো ঘৃণাই যেন পাক খেয়ে বিদ্যুতের তরঙ্গের মতো ঝাঁকাতে লাগল তাকে। কী যেন বেরিয়ে যাচ্ছে তার শরীর থেকে! ইলেকট্রিক চার্জ? না কী এটা?

টর্চটাকে মাটিতে গড়াতে দেখল সরোজ। আর দেখল কেউ সামনে নেই। শুধু দেয়ালে হাত আঁচড়ে জিজা দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ওর গা উদোম, প্যান্টটা একটু নামানো।

সরোজ আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। কামিজটা টর্চের আলোয় খুঁজে পেয়ে জিজার হাতে দিল। মাটিতে উল্টোপাল্টা হয়ে পড়ে আছে এগারো—না, মোট বারোজন। তাদের একজনের হাতে জিজার ব্রা। সরোজ সেটাও কুড়িয়ে নিয়ে জিজার হাতে দিয়ে বলল, চলো।

জিজার হিক্কার মতো শব্দ উঠছিল গলা দিয়ে। থরথরানি বয়ে যাচ্ছে শরীরে। দু হাতে সরোজকে আঁকড়ে ধরে বলল, আমাকে নিয়ে চলো! আমাকে নিয়ে চলো।

কারখানার শেড-এর তলায় নিঝুম অন্ধকারে এসে যখন দুজনে বসল তখন দুজনেই শীতে, ভয়ে, অনিশ্চয়তায় কাঁপছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ভুলে দুজনেই আঁকড়ে আছে দুজনকে প্রাণপণে। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না দুজন।

তারপর এক সময় সরোজ মৃদু স্বরে ডাকল, জিজা।

বলো।

ওরা তোমাকে কী করতে চেয়েছিল?

বোধ হয় রেপ, তারপর খুন।

সরোজ মাথা নাড়ল। বলল, ওদের মধ্যে কালু ছিল, আর ভিখু। ওদের কী হল বলো তো! মরে গেল?

www.boiRboi.blogspot.com

হ্যাঁ। স্টোন ডেড।

কে ওদের মারল জিজা ?

জিজার নরম হাত এসে সরোজের মুখ চাপা দিল। ফিসফিস করে জিজা বলল, ওদের নেমেসিস। নিয়তি। তুমি ও কথা আর জিজ্ঞেস করো না।

সরোজ হাতটা সরিয়ে দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঁপা গলায় বলল, আমি জিজা। আমি।

প্লীজ !

সরোজ চুপ করে গেল। আরও ঘন হয়ে বসল দুজন। দুটো মানুষ যেন এক হয়ে যেতে চাইছে।

তারা দুজনেই শুনতে পেল, পাঁচিলের ওপাশে বহু মানুষের কোলাহল। উত্তেজিত চিৎকার আর চেঁচামেচি। জিপ গাড়ি এবং ভ্যানের আওয়াজ। অনেক আলো।

দুজনে আতঙ্কিত চোখ-কান খোলা রেখে কাঁপতে লাগল ভয়ে, অনিশ্চয়তায়, শীতে।

আস্তে আস্তে কোলাহল থেমে গেল। জিপ আর ভ্যান চলে গেল। নিঝুম হয়ে গেল চারদিক। তারপরও অনেকক্ষণ দুজনে দুজনের শরীরের থরথরানি টের পেতে লাগল।

★ ★ ★

জিজা হঠাৎ দেখতে পেল, তাদের দুজনের সামনে বিশাল চত্বরে কখন নিঃশব্দে সার সার লোক এসে দাঁড়িয়েছে। কারও মুখে কথা নেই। প্রত্যেকের বিস্মিত চোখ তাদের ওপর স্থিরনিবদ্ধ।

জিজা তড়িতাহতের মতো উঠে দাঁড়াল। চকিতে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করল সরোজকে।

দেখল, পুলিশের বড়কর্তা হাতে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে, তাঁর দুপাশে দু সার পুলিশের হাতে উদ্যত রাইফেল। অন্যদিকে শুভেন বোস, উমাপতি, শ্রীময়ী এবং আশ্চর্য ব্যাপার শুভঙ্কর। পিছনে আরও অনেক লোক। কারও মুখে কথা নেই।

জিজা এই নীরবতা সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, কী চান আপনারা ? কী চান ?

পুলিশের বড় কর্তা হিন্দী ছবির ভিলেনের মতো রিভলভারের নলটা বাঁ হাতের তেলোয় ঠুকতে ঠুকতে বললেন, হি ইজ এ কিলার।

জিজা চিৎকার করে ওঠে, কক্ষনো না। কোনও প্রমাণ নেই।

বড় কর্তা মাথা নাড়লেন, প্রমাণ নেই। কিন্তু সারকামস্টেনসিয়াল এভিডেন্স

www.boiRboi.blogspot.com

আছে মিস রায়।

নেই, নেই, কিচ্ছু নেই। যারা মরেছে তারা নিজের দোষে মরেছে। তারা ওর বাড়ি রেড্ করেছিল, ওকে খুন করতে চেয়েছিল, হাসপাতালে গিয়েছিল ওকে মারতে। ওরা আমাকে রেপ করে খুন করতে চেয়েছিল···

বিকারের গলায় চিৎকার করছিল জিজা।

আশ্চর্য এই যে, উমাপতি বা শ্রীময়ী চুপ করে রইলেন। তাদের চোখে বিস্ময় এবং একটু ভয়। যেন তারা সরোজকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। জিজা তার বাবার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল, বাবা, তুমি পুলিশকে বুঝিয়ে বলো, ও কিছু করেনি।

করেছে জিজা। হি হ্যাজ কিলড ফোরটিন মেন।

না।

উমাপতি মাথা নেড়ে বললেন, কথাটা মিথ্যে নয়।

জিজা চেঁচিয়ে উঠল, বউদি আপনি ?

শ্রীময়ী চোখে আঁচল চাপা দিল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, ও তো এরকম ছিল না ! ও কেন গুণ্ডাদের চেয়েও খারাপ হয়ে গেল ?

অসহায় জিজা পুলিশের বড় কর্তার দিকে চেয়ে জোড় হাতে বলল, প্লীজ ! প্লীজ ! বিশ্বাস করুন আমাকে। আমি সারাক্ষণ ওর সঙ্গে আছি। ও কিছু করেনি।

বড় কর্তা পিস্তলটা তুলে বললেন, সরে যান মিস রায়। আমি এরকম বিপজ্জনক লোককে ছেড়ে রাখতে পারি না। আই হ্যাভ দি অর্ডার টু শ্যুট অ্যাণ্ড কিল অ্যাট সাইট।

না, না, না, না···

পাগলের মতো জিজা চেঁচাতে লাগল।

হঠাৎ একটা নাড়া খেয়ে ঘুম ভাঙে জিজার। চোখে তখনও জল। বুকে সাঙ্ঘাতিক কাঁপুনি।

নরম স্বরে সরোজ বলল, দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে ?

জিজা দু হাতে সরোজকে এত জোরে চেপে ধরল যেমনটি সে আর কখনও কাউকে ধরেনি। ফিসফিস করে বলল, ভীষণ দুঃস্বপ্ন।

সরোজ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর আমাদের কী আছে ?

ওকথা বোলো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সরোজ জবাব দিল না। শুধু বলল ঘুমোও।

শেড-এর নীচে তিনদিক খোলা উদোম জায়গায় ফাটা ভাঙা সিমেন্টের

নোংরা মেঝেয় দুজনে এক অর্ধনারীশ্বর মূর্তি রচনা করে শুয়ে আছে। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। হিম আসছে। চামচিকে আর বাদুড় উড়ছে চারপাশে। ডাকছে ইঁদুর। আরশোলার পাখার শব্দ উঠছে।

তবু ঘুমিয়ে পড়ল জিজা। নরম বিছানা ছাড়া যার ঘুম হয় না সেই জিজা সরোজের রোগা বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত এক ঘুমে ঢলে পড়ল ফের।

সরোজের ঘুম ছিল না। নিঃসাড়ে নিঃশব্দে জেগে ঘুমহীন জ্বালাধরা চোখে সে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। কী হল তার? কেন হল? সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে বহু মৃত্যুর কারণ হবে সে। হয়তো তার দোষেই ধড়ফড় করে চোখের সামনে মরে যাবে তার প্রিয়জনেরা। এক মুহূর্তেই রাগ বা ঘৃণা তার পক্ষে কতখানি দুঃসহ দুঃখ বয়ে আনবে তার কি কিছু ঠিক আছে?

সরোজ বুঝতে পারছিল, তাকে খুব তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। আর কোনও ঘটনা ঘটবার আগেই।

বুকের কাছে সুন্দর মুখখানার দিকে আধো-অন্ধকারে বড় মায়াভরে চেয়ে রইল সরোজ। কপালে আলতো করে গালটা ছোঁয়াল একটু। তারপর খুব ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে দিল। জিজা একটু অস্ফুট শব্দ করে আবার তলিয়ে গেল ঘুমে। বড় ক্লান্ত বিপর্যস্ত।

সরোজ উঠল। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। ট্রেন লাইন অবধি পৌঁছোতে তার বেশি সময় লাগবে না। সকালে যে ট্রেন প্রথম আসবে তার সামনে শুধু শরীরটাকে ফেলে দেওয়া। পারবে সরোজ। বাঁচবে।

কোথায় যাচ্ছো?

সরোজ ফিরে তাকাল, জিজা, আমি-আমি-মনে হচ্ছে আমার বেঁচে থাকা ভীষণ বিপজ্জনক জিজা। আমার কাছে যারা আসবে তাদেরই বিপদ! জিজা, তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাও—প্লীজ!

জিজা নিজের কোমল করতলে তার হাতটা চেপে ধরে বলল, মরলে কি কোনও সমস্যার সমাধান হবে? কোনও রহস্যের?

না। আমি সমাধান চাই না। আমি ভয় পাচ্ছি জিজা।

জিজা মাথা নাড়ল, না। ভয় পেও না। আমি তোমাকে মরতে দেবো না।

কিন্তু আমার বেঁচে থাকা মানেই—

বোলো না, ওকথা বোলো না। আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব। আমরা কোনও নির্জন জায়গায় চলে যাবো।

সরোজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, তোমার চাকরি?

চাকরির চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট তুমি।

সরোজ দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল।

জিজা তার ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে সরোজের হাত ধরে বলল, চলো।

কারখানার ফটক পেরিয়ে মাঝরাতের নির্জনতায় তারা দ্রুত হাঁটছিল। চারদিক ফাঁকা, বিপদমুক্ত। কার্তিকের কুয়াশামাখা আধো অন্ধকারে তারা এক অনির্দেশ্য নির্জনতার সন্ধানে চলল।

এই জনসমাকীর্ণ পৃথিবীতে তারা নির্জন কোনও জায়গা খুঁজে বের করতে পারবে কিনা বলা শক্ত। যেখানে আক্রমণকারী নেই, নির্যাতনকারী নেই, হিংস্র নেই এমন একটা স্বপ্নের দেশ তারা কোথায় পাবে? কিন্তু গভীর বিশ্বাসে আর ভালবাসায় সেই স্বপ্নের দেশের সন্ধানে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900